ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)
বাংলাদেশ ঃ
রক্তাক্ত অধ্যায়
১৯৭৫-৮১

বাংলাদেশ ঃ রক্তাক্ত অধ্যায়

১৯৭৫-৮১

ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন

এনডিসি, পিএসসি(অবঃ)

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ
বি এ অনার্স, এম এ
পরিচালক
পালক পাবলিশার্স
৮/২ নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
জি পি ও বক্স নং ৪১৫, ঢাকা-১০০০

দ্বিতীয় প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০৬
অমর একুশে বইমেলা ২০০০
প্রথম প্রকাশ
১৪ এপ্রিল ১৯৯৭

প্রচ্ছদ
মোঃ জিয়াউল হক

মুদ্রণ
জাকির আর্ট প্রেস
৯১, বশির উদ্দীন রোড, কলাবাগান, ঢাকা

মূল্য ঃ একশ' বিশ টাকা

ISBN -984-445-095-0

উৎসর্গ

এ দেশের শত শত সৈনিক যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে, পাকিস্তানের বন্দী শিবিরে এবং স্বাধীনতা উত্তর দেশ ও জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং মানসিক ও দৈহিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেএ বইখানি উৎসর্গ করলাম।

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশ ঃ রক্তাক্ত অধ্যায়
১৯৭৫-৮১

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ক্ষমতার কলকাঠি থাকে সেনানিবাসে। এই ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় ছোট বড় ২১টি সামরিক অভ্যুত্থান। প্রতিটি ঘটনায় দেশের বহু কৃতীমান সেনা সদস্য প্রাণ হারান। ১৯৮১ সনের ৩০শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এ অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুরকেও সৈনিকদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। এ অভ্যুত্থানগুলো অধিকাংশ ঘটার সময় লেখক ব্রিগেডিয়ার সাখায়াত হোসেন এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) ঘটনাবলী অতি কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দেখা অভিজ্ঞতা তিনি বইটিতে সবিস্তারে লিখেছেন। বইটিতে আছে -

- বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সশস্ত্রবাহিনীর অভ্যন্তরের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?
- বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীরা কিভাবে বিদেশে পালিয়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশনে কিভাবে চাকুরী পায় ?
- জিয়াউর রহমান কি '৭৫ এর ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডে জড়িত ছিলেন?
- খালেদ মোশারফ কি ভারতের অনুচর ছিলেন ?
- কর্নেল (অবঃ) তাহেরকে কেন ফাঁসী দেয়া হয়?
- জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে কতটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়? এতে কারা জড়িত ছিলেন এবং কতজন প্রাণ হারান?
- মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর এবং মেজর জেনারেল শওকত আলীর ঠান্ডা লড়াই।
- জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেও মঞ্জুর কেন নিজের জীবন বাঁচাতে পারলেন না ? এবং
- হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের নেপথ্যে অনেক তথ্যবহুল ঘটনা এই বইটি হুবহু বর্ণনা রয়েছে।
- এছাড়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিভাবে সশস্ত্রবাহিনী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং সশস্ত্রবাহিনীর রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ রোধে রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কি করণীয় ছিল, সামরিক বাহিনীকে কিভাবে ক্ষমতা দখল থেকে বিরত রাখা যায় তার একটি সমাধানের পথও রয়েছে এই বইটিতে। অনুসন্ধানী ও জ্ঞান পিপাসু পাঠকদের জন্য তথ্য সমৃদ্ধ এই বইটি যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বইটির মূল্য ঃ নব্বই টাকা।

ফোরকান আহমদ
পরিচালক-পালক পাবলিশার্স

আমার কথা

১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীর মানচিত্রে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের একটি পরিবর্তন সূচিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে, যার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৯৭১ সনে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে।

এতগুলো বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন তাঁদের এবং যাঁরা এর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে হয়েছেন অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত তাঁদের ত্যাগ আর স্বপ্নের সফল পরিণতিতে এক অপরিচিত পূর্ববাংলার মানুষ পেল একটি স্বাধীন জাতিসত্বা ও স্বাধীন নাগরিকের পরিচয়।

বাংলাদেশের ইতিহাস যা রক্তাক্ত হয়েছিল সংগ্রামের শুরু থেকে, রক্তাক্ত রয়ে গেল স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক অধ্যায়েও। স্বাধীনতার সুফল সকলের জন্য। এ স্বাধীনতা অর্জনে যেমন এককভাবে কারও দাবী থাকতে পারেনা, তেমনি যাঁদের নেতৃত্বে, ত্যাগ তিতিক্ষায় বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ তাঁদেরকেও খাট করে দেখার নেই কোন অবকাশ। নেতৃত্বে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁদের অনেকেই আত্মহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। জাতির জনক, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা বাঙালি, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের জীবনের মূল্যও দিতে হয়েছে সেই স্বাধীন দেশে যার স্বাধীনতার জন্য তাঁকে সারাজীবন সংগ্রাম আর নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সেনাবাহিনীর কতিপয় জুনিয়র অফিসার, কিছু উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমগ্র সশস্ত্রবাহিনীকে রাজনৈতিক অঙ্গনে জড়িত করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের মধ্যেই থেমে থাকেনি বাংলাদেশের রক্তাক্ত ইতিহাস। এর পরেও সংগঠিত হয় একের পর এক নিশংসতা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাতও হয় সশস্ত্রবাহিনীর ভেতর থেকে। শুরু হয় এক

দীর্ঘ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ প্রয়াস, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অভ্যুদয়, কর্নেল তাহেরের ফাঁসী পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়া ঘনিষ্ট সহকর্মী কর্তৃক নৃশংস ভাবে নিহত হওয়া ও লেফটেনেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল।

এই সল্প পরিসরে অনেক রক্তের স্রোত বয়ে গেছে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমগ্র সশস্ত্রবাহিনী জড়িয়ে পড়েছিল দেশের রাজনীতির সাথে কিছু উচ্চাভিলাষী সেনা অফিসারদের ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে। অনেক সৈনিকের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় অবস্থার বিপাকে পড়ে। অনেকের সৈনিক জীবন ইতি হয় ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে।

১৫ই আগস্টে যে হত্যাযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল তা প্রসারিত হয় ৩রা ও ৭ই নভেম্বরে এবং আপাতত যবনিকা পড়ে ১৯৮১ সনে জিয়াউর রহমানের হত্যার সাথে। হয়ত এসবের পিছনে সুদূর প্রসারিত চক্রান্ত থাকতে পারে; থাকতে পারে বৈদেশিক চক্রান্ত (?) আর প্ররোচনা, যার সঠিক ব্যাখ্যা বা সূত্র পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এ সবের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে ব্যর্থতাও দায়ীত্বশীল রাজনীতিবিদরা এড়াতে পারেননা। যেমন ব্যর্থতা এড়াতে পারেন না এদেশের বুদ্ধিজীবিরাও। তবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কাউকে দায়ী করার জন্য নয়। আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কিছু কিছু ঘটনা যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করেছি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করারও চেষ্টা করেছি যা আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা মাত্র। বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিসারদের, যারা প্রত্যক্ষ অথবা কোন না কোন ভাবে ঘটনা প্রবাহের সাথে জড়িত, তাদের কিছু কিছু কথোপকথনও উল্লেখ করেছি যা এত বছর পর হুবহু মনে নেই তবে তার সারমর্মটুকু সঠিক রেখে চেষ্টা করেছি পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থাকার।

আমি যে সব ঘটনা বর্ণনা করেছি এসব তথ্য অনেকভাবে এর আগেও কিছু কিছু প্রকাশ হয়েছে, তবুও এ প্রয়াস যাতে ভবিষ্যতে এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কোন বিশ্লেষক আগামী প্রজন্মের জন্য রচনা করবেন বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্রুত ঘটে যাওয়া কিছু বেদনাদায়ক অধ্যায়। তবে এখানে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, আমি কাউকে খাট বা বড় করে দেখাবার চেষ্টা

কোথাও করিনি। হতে পারে অনেকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করবেন না, সেটা যেমন সম্ভব নয় তেমনি আমার অভিপ্রায়ও নয়।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে অনেকেই অনেকভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ । বিশেষ করে যাঁরা আমাকে কিছু কিছু তথ্য ও ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করতে চাই তবে কোন কোন কারণ বশতঃ অনেকেই নাম উল্লেখ করতে বারণ করায় তাদের কাছে শুধু কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করলাম।

আমি কর্নেল (অবঃ) সাফায়াত জামিলের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার এ প্রয়াসের বহুল অংশের ঘটনাবলিকে সঠিক তুলে ধরতে সাহায্য করেছেন। আমি মেজর জেনারেল (অবঃ) সাদেকুর রহমান টিকিউএ-এর নিকট কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে কিছু দুঃস্প্রাপ্য ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি লেঃ জেনারেল (অবঃ) বর্তমান মন্ত্রী নুরুদ্দিন খান পি এস সি এর নিকট কৃতজ্ঞ যে তিনি উৎসাহ দিয়ে এবং নিজের ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন। তেমনিভাবে আমি বেগম সালমা মোশারফ, ব্রিগেডিয়ার (প্রয়াত) খালেদ মোশারফের স্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞ ছবি দিয়ে সাহায্য করার জন্য তেমনি কৃতজ্ঞ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নিকটও।

আমি আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট কৃতজ্ঞ যারা আমাকে সর্বতভাবে উৎসাহিত করেছে। আমার বইয়ের প্রকাশক পালক পাবলিশার্স যারা এ ধরনের বই প্রথম প্রকাশ করল এবং এর সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ফোরকান আহমদ যিনি এ বইটি প্রকাশ করতে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং কঠোর পরিশ্রম করে সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন এ জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ

ঢাকা | **ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন**

মার্চ ১৯৯৭ | এন ডিসি, পিএসসি (অবঃ)
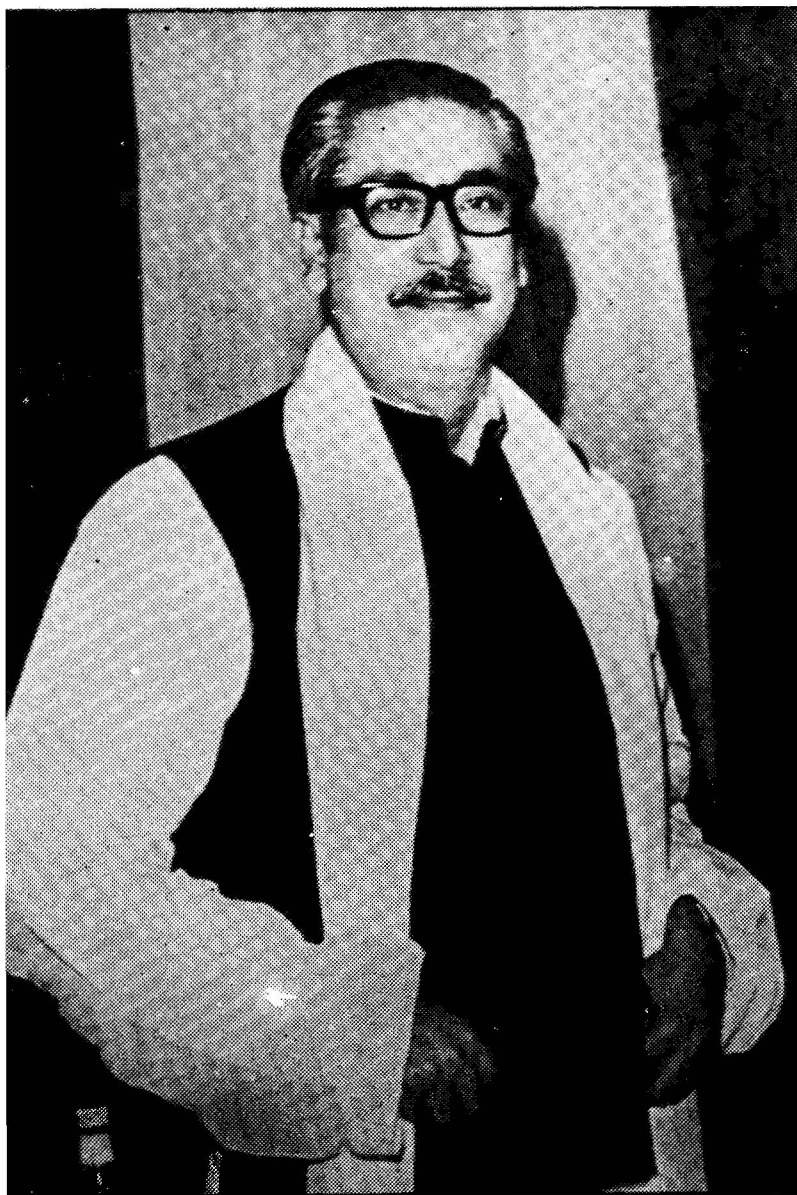
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এক

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সন, ভোর আনুমানিক ৬টা, সূর্য একটু উপরে উঠাতে ভোরের আলো ঘরের মেঝে লুটিয়ে পড়েছিল। আমার শিয়রের নিকট রাখা বেসামরিক টেলিফোনটি বেজে উঠল। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখ মেলে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটি তুলে কানের কাছে নিয়ে 'হ্যালো' বলার সাথে সাথে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল, শান্ত অথচ গম্ভীর এক অপরিচিত গলার আওয়াজ 'রেডিও খুলুন আর ব্রডকাস্ট শুনুন'। পরিচয় জিজ্ঞেস করার আগেই অপর প্রান্ত থেকে রিসিভার রেখে দেয়ার আওয়াজ পেলাম। আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না কে সেই কলটি করেছিল।

আচমকা ঘুম থেকে উঠাতে বুঝে উঠতে সময় লাগল। ভাবলাম কি এমন বিষয় হতে পারে যা এতসকালে রেডিও থেকে ব্রডকাস্ট হতে পারে? ক্ষণিকের চিন্তায় তেমন কিছুই মাথায় আসছিলনা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রক্তক্ষয়ী আধিপত্যের অবসান হয়েছে পলায়নপর শেষ মার্কিন সৈনিকের ভিয়েতনাম ত্যাগ করার সাথে সাথে। আর বাংলা দেশে তখন ছিল এক দলীয় বাকশালের শাসন। সৈনিক হিসেবে যদিও সেটা আমার খুব একটা ভাববার বিষয় নয় তবে বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে তা জানার কথা। কেন এমন ব্যবস্থা নিতে হল তৎকালীন সরকারের এবং সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি সারা জীবন লড়ে গেছেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্যে। যতদূর শুনেছি যে, এ ব্যবস্থার পক্ষে শেখ মনি তার প্রভাব অত্যন্ত সূচারুভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করেন। গুজবে শোনা যেত যে, শেখ মনি রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর এ ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্যে ৬০ জেলায় নিয়োগ দেয়া হয়েছিল গবর্ণরদের

যাদের কার্যভার গ্রহণ করার কথা ছিল এই দিনে, মানে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সনে।

এতক্ষণে বাসার সবাই ঘুম থেকে উঠে গেছে। রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র ধরতেই ভেসে এল আমার অত্যন্ত পরিচিত গলার আওয়াজ "আমি ডালিম বলছি; স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল 'ল' জারি করা হল।" কিছুক্ষণ পর পরই একই ঘোষণা আর ফাঁকে ফাঁকে সামরিক বাদ্যের সুর বাজতে লাগল। শুধু এতটুকুই নয়, ডালিমের প্রথম ঘোষণায় বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বলেও ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য এ ঘোষণা আর শোনা যায়নি।

এ সবকিছুই আমার নিকট গোলমেলে মনে হচ্ছিল। কিছুতেই অংক মিলাতে পারছিলাম না। এটা কি করে সম্ভব? বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা একটা দুঃস্বপ্নের মত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তৎকালীন অবস্থায় এ ধরনের একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে এটা ধারণার বাইরে ছিল। আর তা ছাড়া এরকম একটা সামরিক অভ্যুত্থান হল অথচ ঢাকায় অবস্থিত ৪৬ ব্রিগেডের স্টাফ অফিসার হয়েও জানতে পারলাম না বা কখন এমন একটা কিছু আভাস ইঙ্গিতও পেলাম না। মনে পড়ল বেশ কয়েক দিন পূর্বে শরিফুল হক ওরফে ডালিমকে ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে সাক্ষাতের পর আমার সাথে দুপুরের খাবারের জন্যে আমার বাসায় নিয়ে এসেছিলাম। তখন ডালিম সামরিক বাহিনী থেকে সদ্য চাকুরিচ্যুত। দুপুরের আহারের পর অনেক গল্প হল। এরই ফাঁকে এক পর্যায়ে সে বলল 'স্যার চোখ কান খোলা রেখে চাকরি করবেন'।

সে সময়ে আমি ঢাকায়, ৪৬ ব্রিগেডের মেজর পদবির স্টাফ অফিসার হওয়ার সুবাদে সার্বক্ষণিকভাবে ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে আমাকে যোগাযোগ রাখতে হত এবং তৎকালীন ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল (বর্তমানে অবঃ) বীর বিক্রমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের কোন আভাস আগে পাইনি। যদিও কখন কখন দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে হালকা আলোচনা হলেও কল্পনাও করিনি এরকম একটা ঘটনা হঠাৎ করে ঘটতে পারে বা এর পেছনে কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল আর তা আমার ব্রিগেড কমান্ডার কি জানতেন না? আর তিনি জানলে কোন না কোন ইঙ্গিত আমিও হয়ত পেতাম। গত রাতেও, মানে ১৪ই আগস্ট রাত প্রায় ১০টা কি ১১টার সময়েও কমান্ডারের সাথে আমার শেষ কথা হয়। তখন তিনিই আমাকে জানালেন যে,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। ব্রিগেড ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানী থেকে একটা প্লাটুন পাঠাতে হবে যারা সমস্ত এলাকা সার্চ করবে আর সে রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই থেকে যাবে। যদিও একাজ ব্রিগেড মেজর এর (বিএম) আওতায় পড়ে তবে মনে হল তিনি তৎকালীন বিএম মেজর হাফিজ উদ্দিনকে (বর্তমানে সংসদ সদস্য) না পেয়ে আমাকেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বললেন। আমি ব্রিগেড কমান্ডারের নির্দেশ ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানীর অধিনায়ককে জানিয়ে দেই। স্মরণ থাকে যে, ১৫ই আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেদিন আরও একটা গুজব ছিল যে, এ সমাবর্তনের সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের আজীবন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেয়া হবে এবং সেদিন থেকেই ৬০টি জেলায় জেলা গবর্নরও নিযুক্ত করা হবে। নিয়তির কি নির্মমতা, তাঁকে সে মর্যাদাই দিল তিনি বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা ও রাষ্ট্রপতি হয়েই ইতিহাসে থাকবেন। একেই বোধ হয় বলা হয় Man proposes and God disposes.

ঘটনাটি এমনই গুরুতর যে, অনেকক্ষণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় এর মত বসে রইলাম। কি করব? আমার এ মুহূর্ত কি করণীয় থাকতে পারে? এসব ভাবনার যেন কোন শেষ নেই। অফিসে গিয়েই সব ঘটনা জানার চেষ্টা করতে হবে বলেই সিদ্ধান্ত নিলাম। তার পূর্বে কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে তার বাসায় ফোন করতেই বেগম জামিল জানালেন, সাফায়াত জামিলকে কিছুক্ষণ আগে ২ ফিল্ড আর্টিলারীর অধিনায়ক মেজর রশীদ এসে এ খবর দেয়ার পর পরই তিনি বিএম মেজর হাফিজকে নিয়ে বাসা থেকে হেঁটেই বের হয়ে গেছেন।

মেজর খন্দকার রশীদ, ৪৬ ব্রিগেডের অধিনস্থ ২য় ফিল্ড আর্টিলারীর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক। একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীর এলাকা থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। মিলিটারী একাডেমিতে আমার ৩ কোর্স জুনিয়র কিন্তু ২ বৎসরের সিনিয়রিটি পাওয়াতে অনেক সিনিয়র হয়ে যায়। এই স্বল্পভাষী ধীরস্থির অফিসারটি কিছুদিন পূর্বে ভারতের দেওলালী থেকে গানারী স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আর্টিলারী ইউনিটের অধিনায়ক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ সে যুদ্ধের পর থেকেই উক্ত ইউনিটেই চাকুরি করে। গানারী স্টাফ করেছেন বলেই স্বভাবত তার পরবর্তী নিযুক্তি হওয়ার কথাছিল যশোরে অবস্থিত কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলে আর্টিলারী ইন্সট্রাক্টর হিসেবে। হয়েও ছিলও তাই; কিন্তু কিছু দিন পর কোন কারণ ছাড়াই

তার নিযুক্তি প্রত্যাহার করা হয়। এ প্রত্যাহার কেন করা হয়েছিল তা আমার আর ব্রিগেড কমান্ডারের জানা ছিলনা। এর কারণ হয়ত আজও রহাস্যাবৃত। রশীদের সাথে আমার পরিচয় মিলিটারি একাডেমি থেকেই জুনিয়র ক্যাডেট হিসেবে। রশীদের পূর্বের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সালাহউদ্দিন যিনি DMI নিযুক্ত হবার পর কিছুদিনের জন্যে অধিনায়ক ছিলেন লেঃ কর্নেল আনওয়ার হোসেন (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত)। রশীদ ছিল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক, পরে সে আনওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হয়।

রেডিওতে পুনঃপুন একই ঘোষণা হতে লাগল। সময় প্রায় ৬.৩০ মিনিট। চারদিক অস্বাভাবিক ভাবে নিশ্চুপ, মাঝে মধ্যে সেনানিবাসের প্রধান সড়ক দিয়ে কিছু ভারী গাড়ীর আওয়াজ। আমি দ্রুত তৈরী হতে লাগলাম আর রেডিওতে একটানা মেজর ডালিমের ঘোষণা শুনতে থাকলাম।

মেজর শরিফুল হক। ছোটনাম ডালিম। সুঠাম, শ্যামলা রংয়ের সুশ্রী অফিসার। বেশ স্মার্ট, স্বভাবে বদমেজাজি, একরোখা। ১৯৬৮ সনে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে কমিশন পেয়ে কোয়েটার এক আর্টিলারি ইউনিটে যোগদান করে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেখান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিযুদ্ধে গুরুতর আহত হয়। তার সাহসিকতা আর বীরত্বের জন্যে তাকে বীর উত্তম পদে ভূষিত করা হয়।

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রায় একবছর পর আমার সাথে ডালিমের পুনঃ দেখা হয়। ডালিম তখন সদ্য জার্মানী থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরেছিল। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক মাসের জন্য আমি কুমিল্লায় অবস্থিত ১ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলাম। ডালিম আমাদের অনেকের জুনিয়র হয়েও একাডেমি ও মুক্তিযুদ্ধের সিনিয়রিটি নিয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছরের সিনিয়রিটি পেয়ে যায়। এ সুবাদে সে ঐ ইউনিটে উপ-অধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু সে বিদেশে ছিল যে জন্যে আমার সাথে কুমিল্লায় তার সাক্ষাৎ হয়নি। পরে যখন ঢাকায় প্রথম দেখা হয়, দেখলাম সেই সদাহাস্যোজ্জ্বল মুখ, সেই অমায়িক সম্ভাষণ ঠিক যেমনটি আমি তাকে প্রথম ১৯৬৮ সনে দেখি সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে নওশেরা (পাকিস্তান) আর্টিলারী স্কুলে বেসিক কোর্স করতে। আমি তখন তরুণ ক্যাপটেন হিসেবে একটি কারিগরি ট্রেনিং-এ একই স্কুলে শিক্ষাণবীশ অফিসার ছিলাম।

প্রথম পরিচয়েই ডালিমকে আমার ভাল লাগে। আমি এবং ওর আরও বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায়ঃশই এক সাথে ছুটির দিনগুলো হৈ হুল্লোর করে কাটাতাম।

সবার মধ্যে ডালিমই অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, স্পষ্টভাষী ও একগুঁয়ে হিসেবেই পরিচিত ছিল। প্রায়ই ওর একরোখা মেজাজ আর গোয়ার্তুমির জন্য ছোটখাট বিপদে পড়তে হত। তবে পরে এসব আমরা উপভোগই করতাম। ডালিমের সাথে পাকিস্তানে আমার শেষ দেখা হয় কোয়েটাতে ১৯৭০ সনের শেষের দিকে। অনেকদিন পর দেখা হওয়াতে আমরা অনেক সময় একত্রে কাটাতাম। ওর মুখেই শুনলাম এর মধ্যে একবার সে ছুটিতে ঢাকা এসেছিল এবং তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে শেরাটন) একদল উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের সাথে গন্ডগোল হয়। পরে এ কারণে তাকে বেশ কিছুদিন তৎকালীন ১৪ ডিভিশনে কোর্ট অব ইনকোয়ারীর জন্য সংযুক্ত রাখা হয়েছিল। এটাকে ওর স্বভাবজাত কান্ড ছাড়া আর কিছুই মনে করিনি। তবে আমি জানতাম ছোট বেলা ওর মাকে হারাবার পর থেকে ডালিম একটু জেদী আর একগুঁয়ে হয়ে উঠে এবং সে নিজের ভাইবোনদের প্রতি ছিল অভ্যন্ত দুর্বল। তার বাবার দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তার এ ধরনের একগুঁয়েমি আর বেপরোয়াভাব দেখা দেয়। ওর ভিতরে ছিল এক রকমের অদম্য বন্য সাহস। রাগের মাথায় ওর দ্বারা যে কোন কিছু করা বা করানো সম্ভব ছিল।

রেডিওতে তখনও একটানা ঘোষণা চলছে আর ফাঁকে ফাঁকে রণবাদ্য বাজছিল। আমি হেঁটেই অফিসের দিকে রওয়ানা হলাম। বাসা থেকে বের হতেই প্রধান সড়কের উল্টোদিকে সেনাপ্রধানের বাড়ীর ফটকে দেখলাম কিছু সামরিক জীপের আনাগোনা। তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কাজী মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, মুক্তিযুদ্ধে একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন যার সেক্টর ফোর্সের নামকরণ করা হয়েছিল তারই নামের ইংরেজি আদি অক্ষর দিয়ে 'এস ফোর্স' যা পরে ৪৬ ব্রিগেডে সংগঠিত হয়ে ঢাকায় অবস্থান করে এবং আজও স্বতন্ত্র ব্রিগেড হিসেবে রয়ে গেছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জয়দেবপুরে অবস্থানরত ২য় বেঙ্গলে মেজর পদে উপ-অধিনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়েই তার পদোন্নতি হয় এবং ১৯৭৩ এ, দু' বৎসরের মাথায় মেজর হতে মেজর জেনারেল পদে উন্নতী হয়ে সেনা প্রধান হন। তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন যা এখনও সেনাভবন নামে পরিচিত সেটা এককালে পাকিস্তানের ১৪ ডিভিশনের জিওসির বাড়ী ছিল।

জেনারেল শফিউল্লাহর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয় ১৯৭০ সনে যখন তিনি কোয়েটার স্টাফ কলেজ শেষ করে সেখানের ইনফেনট্রি স্কুলে ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে তাঁকে বীর উত্তম পদেও ভূষিত করা হয়।

রাস্তায় বের হওয়ার আগে ভেবেছিলাম সেনা ভবনের আশেপাশে বা প্রধান সড়কে সৈনিকদের তৎপরতা বেশী থাকবে কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়লনা। প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতিও তেমন অস্বাভাবিক মনে হল না। মাঝে মধ্যে কয়েকটি সামরিক গাড়ীর আনাগোনা ছাড়া আর তেমন কিছুই চোখে পড়লনা।

কিছুক্ষণ হাঁটার পরই আমি আমার অফিস ৪৬ ব্রিগেডের সদর দপ্তরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলাম না। না পাওয়াই স্বাভাবিক কারণ তখনও অফিসের সময় শুরু হতে দেরী থাকায় আর কোন স্টাফ এসে পৌঁছেনি। Duty Runner আমাকে দেখে জানালো BM মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদ এসেছিলেন পরে তিনি কমান্ডারের বাসার দিকে গিয়েছিলেন, তারপর সকলে মিলে ১ম বেঙ্গলের দিকে গিয়েছেন। মেজর হাফিজউদ্দিন ১ম বেঙ্গলেই কমিশন প্রাপ্ত হন এবং কিছুদিন আগ পর্যন্ত তিনি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, উপ-সেনাপ্রধানের একান্ত সচিব ছিলেন। হাফিজ উদ্দিন ১ম বেঙ্গলের সাথেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং একজন কৃতি ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে দেশে খ্যাত ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বেই BM হিসেবে মেজর গফফার হালদারের স্থলাভিষিক্ত হন।

মেজর গফফার হালদার (পরে লেঃ কর্নেল ও জাতীয় পার্টি থেকে মন্ত্রী ছিলেন) ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে কমিশন প্রাপ্ত হন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কুমিল্লা সেক্টরের হালদা নদী অপারেশনে তার সাহসিকতার জন্য তাকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন। যদিও গফফার হালদার আর্মি হেডকোয়ার্টারে বদলি হয়ে যান কিন্তু তখনও তিনি সেখানে যোগদান করেননি।

আমি আমার অফিসে একাই বসে ভাবছিলাম আমার এ সময়ে কি করণীয় থাকতে পারে। আমার কি ১ম বেঙ্গলের দিকে, যেখানে কমান্ডার আছেন সেখানে যাওয়া উচিত, না নিজের অফিসে বসে থাকাই ভাল এ চিন্তা করছি। শেষ পর্যন্ত নিজের অফিসে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়ে অসহায়ভাবে বসে রইলাম। নিজের অফিসে বসেই পরিস্থিতি অনুধাবন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি Duty Runner কে ডেকে এককাপ চা আনতে বলে বসে বসে ভাবছিলাম এ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে। আর ভাবছিলাম বাংলাদেশে এ এক অবিশ্বাস্য রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থান, যাতে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যু, তাঁর বাঙালীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, সারা জীবনের রাজনৈতিক সংগ্রাম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ অবশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক এবং দেশ স্বাধীন করার

অনুপ্রেরণা যোগানো সবই যেন কয়েকটি বিক্ষুব্ধ বুলেট শেষ করে দিয়ে গেল। শেষ করে দিল বাংলাদেশের দীর্ঘ সংগ্রামের নেতৃত্ব দানকারীর প্রাণ।

ভাবছিলাম এহেন পরিস্থিতি যা আমার অনুভূতিতে বাংলাদেশের জন্য ছিল অকল্পনীয়। এতে কার বা কি করণীয় থাকতে পারে ? সমগ্র রক্তাক্ত বিদ্রোহ বা বিপ্লব যার উদাহরণ পাওয়া যায় ষাটের দশকে মধ্যপ্রাচ্যে। সে ধরনের ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার মত মানসিকতা বাংলাদেশের জনগণের আদৌও আছে কিনা না, থাকলে তাদের Reaction হতে পারে? এ সময়ে যখন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আর বাঙালী জাতি হিসেবে তখনও সুসংগঠিত হতে পারেনি। পারেনি নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ক্ষত শুকাতে। শেষ হয়নি পাকিস্তানী বর্বরতার শিকার স্বজন হারাদের ক্রন্দন।

একটি জাতি বা দেশ যখন জন্ম নেয় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে জাতি সুসংগঠিত হতে নেয় প্রচুর সময়। এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়, তবুও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের অভ্যুত্থানকে ইতিহাস হয়ত ক্ষমার চোখে দেখবেনা। কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশ আর বাঙালী, দেশ ও জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন সংযোজন হতে পারে তবে এর ঐতিহ্য, কৃষ্টি আর সামাজিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিক ভাবেই পৃথিবীর সভ্যতার শিখরে ছিল। বাংলাদেশ এবং তার ঐতিহাসিক সভ্যতার পরিচিতি পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম অগ্রদূত হিসেবেই ছিল।

এত সবকিছু চিন্তাভাবনার মধ্যেও যে সত্যটি আস্তে আস্তে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল তা হল যে, এ অভ্যুত্থানের সাথে সমগ্র সেনাবাহিনী জড়িত নয়। পরে জানতে পারলাম ৪৬ ব্রিগেডের অধীনস্থ ২য় আর্টিলারী রেজিমেন্ট যার অধিনায়ক মেজর রশীদ এবং সেনাসদরের অধীনস্ত ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার রশীদ ও ল্যান্সারের উপ-অধিনায়ক মেজর সৈয়দ ফারুক রহমানের নেতৃত্বেই মূলতঃ এ অভ্যুত্থান ঘটে। সৈয়দ ফারুক রহমান তার অধিনায়ক মেজর আব্দুল মোমেন (পরে ব্রিগেডিয়ার ও রাষ্ট্রদূত) ছুটিতে থাকাকালীন অবস্থায় অধিনায়কের দায়িত্বে ছিল। প্রসঙ্গত, ফারুক ও রশীদ দু'জন আত্মীয়তাতে ভায়রা ভাই। মেজর শরিফুল হক ডালিম যাকে কিছুদিন পূর্বে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়, মেজর বজলুল হুদা যে তখন সেনাসদর গোয়েন্দা পরিদপ্তরে নিয়োজিত এবং সাথে আরও কিছু অবসর প্রাপ্ত ও চাকুরিরত অফিসাররা এবং এ দু'টি ইউনিটই প্রাথমিক পর্যায়ে জড়িত ছিল। এখানে উল্লেখ্য,ডালিম ১ম আর্টিলারী রেজিমেন্ট থেকে অবসর নেয় আর হুদা ঐ ইউনিটেরই এডজুডেন্ট ছিল আর ঐ সময়ে ১ম আর্টিলারী ইউনিটের

সৈনিকরাই বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আমি ভাবছিলাম সেনাবাহিনীর বাকি অংশের মনোভাব কি? সিনিয়র অফিসাররা মুষ্টিমেয় জুনিয়র অফিসারেদের নেতৃত্বে ঘটে যাওয়া এই অভ্যুত্থানকে কিভাবে গ্রহণ করবেন? এ সবের উত্তর ঠিক সে সময় জানার মত অবস্থা আমার ছিলনা।

সবচেয়ে বেশী যে আশংকাটি আমার মনে উঁকি দেয় সেটি ছিল মারাত্মক। যার পরিণতি হতে পারত ভয়াবহ। আর সেটা ছিল তৎকালীন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রতিক্রিয়া।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী, যার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান (পরে রাষ্ট্রদূত এবং প্রয়াত)। নুরুজ্জামান বঙ্গবন্ধুর সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তাকে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তাকে প্রথম কমানডান্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই প্রথম দেখলাম জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামক অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল একটি বাহিনী যার গায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম, হাতে ভারতীয় আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও অন্যান্য সরঞ্জাম। রক্ষীবাহিনীর সব অফিসারই, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সামরিক অফিসার ছাড়া ভারতের দেরাদুনের ব্যাটল স্কুল থেকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সরাসরি রক্ষীবাহিনীর ব্যাটালিয়নগুলোতে নিয়োজিত করা হত। তবে নিয়োগের পূর্বে সাভারের রক্ষীবাহিনী ট্রেনিং ক্যাম্পে কিছুদিন অন্যান্য প্রশিক্ষণ দেয়া হত। প্রতিটি ব্যাটালিয়ন তখনকার সেনা ব্যাটালিয়নগুলো থেকে সুসংগঠিত ছিল। প্রসঙ্গত ১৯৭৫ সনে রক্ষীবাহিনীতে ১৭টি ব্যাটালিয়ন আর সেনাবাহিনীতেও ১৬টি ইনফেনট্রি ব্যাটালিয়ন ছিল। রক্ষীবাহিনী ছিল একটি অনিয়মতান্ত্রিক বাহিনী ও রাজনৈতিক বাহিনী বলে এটাকে বেশীর ভাগই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হত। এ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কোন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ছিলনা ছিল সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় বা কার্য্যালয়ের অধীনে থাকলে গুজবে শোনা যায় যে, এর প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমেদ। তবে এ ব্যাপারে সঠিক কোন প্রমাণাদি হয়ত নেই। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতেই এ বাহিনীকে সজ্জিত করা হলেও বেশীর ভাগ সময়ে এটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এতবড় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও '৭২ হতে '৭৫ সন পর্যন্ত তিনবার সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করা হয়

আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে, নিয়োজিত করা হয় চোরাচালানীর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার পরপরই সেনাসদস্যদের যে মনোভাব জানতে পারলাম তা হল রক্ষীবাহিনীকে দাঁড় করানো হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে। যদিও এ বিষয়ের উপর কোন লিখিত বক্তব্য বা প্রমাণ না থাকলেও এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যাতে রক্ষীবাহিনীর একজন লীডারকে দেয়া হয়েছিল অফুরন্ত ক্ষমতা। সারাদেশে তখন রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের মনে ছিল চাপা ক্ষোভ। এ বাহিনীর অপব্যবহার আর ঔদ্ধত্যের কারণে জনগণের কাছে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার এক প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে এর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

সেনাবাহিনীতে প্রায়ই অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে রক্ষীবাহিনীর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া যেত। অনেক ক্ষেত্রে সোচ্চার হতেও দেখা যেত। বিশেষ করে যখন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ছুটি কাটিয়ে ইউনিটে ফেরত আসার পর রক্ষীবাহিনী কর্তৃক গ্রামে গঞ্জের নীরিহ জনগণকে হয়রানি করার খবর গল্পের আকারে সৈনিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। অনেক ক্ষেত্রে সেনাসদস্যদের পরিবার পরিজনের উপর অত্যাচারেরও অভিযোগ লিখিতভাবে উত্থাপিত হত কিন্তু কখনই প্রতিকার পাওয়া যেতনা। সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা এবং অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকলেও রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সকলেই একমত পোষণ করত। সকল সদস্যেরই দৃঢ় বিশ্বাস রক্ষীবাহিনীর Budget, Defence Budget থেকে অনেক বেশী ছিল। রক্ষীবাহিনীর রশদ থেকে শুরু করে সকল সরঞ্জামের প্রানধিকার ছিল অন্যান্য বাহিনীর উর্ধ্বে। তখন সেনাবাহিনীতে ইউনিফর্মের ঘাটতি পূরণের জন্যে কিছু কিছু ভারত থেকে আনানো হলেও ওগুলোর সাইজ এত ছোট ছিল যার বেশীর ভাগই সঠিক মাপে লাগতনা। গুজব রটানো হল যে, ভারত ইচ্ছে করে সে দেশের সেনাবাহিনীর বাতিলকৃত পোশাক পাঠায় বলেই এরূপ অবস্থা। তবে এটা সত্য যে, তখন জুতা থেকে রাইফেল পর্যন্ত প্রচুর ঘাটতি ছিল আর এ ঘাটতি মিটাতে এসব সরঞ্জাম আমদানী করা হত ভারত থেকে যার বেশীর ভাগ দ্রব্যই ছিল নিম্নমানের। প্রসঙ্গত বলতে হয় যে, এ প্রচারণা এত বেশী হতে থাকল যে, আস্তে আস্তে সমগ্র সেনাবাহিনী ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠল।

পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সদস্যদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির পর সরঞ্জামাদির অভাব প্রকটভাবে দেখা দেয় বিশেষ করে বাসস্থানের। বলা হত

যেহেতু সরকার Defence Budget আর বাড়াবেন না কাজেই নতুন বাসস্থান তৈরী করাও সম্ভব হবেনা। তবে কিছু কিছু নিম্নমানের ছোট ছোট রুম বিশিষ্ট ব্যারাক তৈরী করে অফিসারদের পরিবার নিয়ে থাকতে দেয়া হয়। এসব বাসস্থানগুলো আজও রূপসা প্রোজেক্ট নামে পরিচিত। অন্য দিকে রক্ষীবাহিনীর জন্য নতুন জায়গার ব্যবস্থা করা হয় এবং সুপরিকল্পিতভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। জেলায় জেলায় গড়ে উঠে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্প আর জোনাল হেড কোয়ার্টারস যার অনেকগুলোকে ১৯৭৫ এর পরে সেনানিবাসে রূপান্তরীত করা হয় যেমন, সাভার, খুলনা, কাদিরাবাদ, মাজিরা ক্যাম্প (বগুড়া), ভাটিয়ারি চট্রগ্রাম ইত্যাদি। এরূপ অনেক সেনানিবাসই হয়ত সেনাবাহিনীর নিবাস যোগ্য স্থান নয় তবুও জায়গার অভাবে এগুলোকেই ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রক্ষীবাহিনীর বিরূপাচারণ শুধু সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয় এমনকি পুলিশের মধ্যে রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপ নিয়ে ছিল প্রচুর সংশয়। পুলিশ প্রশাসন এক অসহায়ত্তের মধ্যে তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করত আবার কোন কোন সময় তারা থাকত নিষ্ক্রিয়।

সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনী নিয়ে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তা আরও বিস্তার লাভ করতে থাকে সেনাসদস্যদের প্রতি রক্ষীদের আচরণের জন্য। এসব বিক্ষিপ্ত আচরণ অনেক সময় সকলের উষ্মার কারণ হতে থাকে। এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। সেগুলো সমগ্র সেনাবাহিনীতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে যথেষ্ট ছিল। ছোট কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য। ১৯৭৫ সনের প্রথম দিকে দিনাজপুরে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট সাইদ ইসকান্দার ছুটিতে থাকা অবস্থায় রক্ষীবাহিনীর সদস্য কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়। সাইদ ইসকান্দার (বর্তমানে মেজর অবঃ ও ব্যবসায়ী) আত্মীয়তার সম্পর্কে তৎকালীন ডিসি এ এস জিয়াউর রহমানের শ্যালক। তবুও এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ঠিক এ ঘটনার কিছুদিন পরেই ঢাকায় অবস্থানরত ৪র্থ বেঙ্গলের ক্যাপটেন গুলজারকে রক্ষীবাহিনীর সদস্যগণ বঙ্গভবনের কাছে তার পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছিত ও অপমান করে। পরে এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে লিখিতভাবে সুবিচার চাওয়া হলে রক্ষীবাহিনী সদর দপ্তর থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়। আর এ ঘটনা সেনাবাহিনীতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। এসব ঘটনা দ্রুত সেনাবাহিনীর সর্বস্তরের সৈনিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ বাড়তেই থাকে।

এ বাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে প্রচুর কথা শোনা যায় আর এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতীয় সেনা অফিসার মেজর রেড্ডি যিনি ছিলেন সাভারে ট্রেনিং সেন্টারের অলিখিত সর্বময় কর্মকর্তা। মেজর রেড্ডির প্রভাব রক্ষীবাহিনীতে ছিল সবচেয়ে বেশী। তাকে ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫ সনে সাভার থেকে ভারতীয় দূতাবাসে হস্তান্তর করা হয়। মেজর রেড্ডির সঠিক পদ কোনদিন জানা যাবে কিনা জানিনা তবে এ বাহিনীর মূল চালিকা শক্তি হিসেবে তাকেই সকলে ধরে নিয়েছিল। মেজর রেড্ডি যার বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়। তিনি সাভারে ট্রেনিং উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন এ বাহিনীর জন্মলগ্ন থেকে। যদিও রক্ষীবাহিনী অফিসারগণ প্রাথমিক ট্রেনিং ভারতে পেতেন। সাভারে দ্বিতীয় পর্যায় তাদেরকে রেড্ডির তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হত। তাকে খুব একটা বাইরে যেতে বা মেলামেশা করতে দেখা যায়নি। আর এ অফিসার সম্বন্ধে তেমন কোন বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায়নি। প্রসংঙ্গত ১৫ই আগস্ট ছিল রক্ষীবাহিনীর ৭ম ব্যাচ অফিসারদের কমিশন প্রাপ্তির দিবস আর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের (প্রয়াত) ঐ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করারও কথা ছিল।

এ সবকিছু মিলিয়েই রক্ষীবাহিনীর সত্ত্বা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিল তৎকালীন শাসক আওয়ামী লীগের সাথে। স্বভাবতই তৎকালীন সরকারের প্রতি ছিল তাদের অন্ধ আনুগত্য। এমনকি রক্ষীবাহিনীর 'ফরমেশান সাইন' ও ছিল বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত তর্জনি যার মানে হল বঙ্গবন্ধুর প্রতি আনুগত্য যা হওয়াটাও ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ এর বেশীরভাগ সদস্যই ছিলেন মুজিব ও কাদের বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য।

১৫ই আগস্ট ছিল শুক্রবার। আর সময় তখন প্রায় ৭-৩০ মিঃ। এক এক করে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সমস্ত করনিক ও অন্যান্য সৈনিকবৃন্দ এসে উপস্থিত হল। সবাই হতবাক ও নিশ্চুপ। সাহস করে কেউই কিছু বলতে পারছেনা। আমি লক্ষ্য করলাম সকলের মুখেই একটা চাপা উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা। ভাবটা যেন এর পরে কি? তবে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ সবাইকে সাময়িকভাবে নিশ্চুপ করে দিয়েছিল। আস্তে আস্তে যে যার অফিসের কাজে লেগে গেল। আমার প্রধান করনিক আমাকে এসে শুধু বললো, 'স্যার কাজটা কি দেশের জন্যে ভাল হল'। আমি তার দিকে তাকাতেই সে আর কিছুই বললো না। চুপ করে রইলাম। এর উত্তর সে মুহূর্তে আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিলনা কারণ এর উত্তর একমাত্র ইতিহাসই দিতে পারবে। আমি আবার একা আমার অফিসে বসা।

তখনও তেমন কোন সংবাদ পাচ্ছি না। এমন সময় বাইরে একটা গাড়ী আসার আওয়াজ পেলাম। কমান্ডার ফিরেছেন মনে করে বাইরে যেতেই দেখলাম প্রাক্তন বিএম মেজর গফ্‌ফার হালদার এসে উপস্থিত। সে আমাকে দেখে কোন কথা না বলে আমার রুমে এসে বসল। মুখে ক্লান্তির ছাপ। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে উঠল, 'সবই ত জানলেন কি ঘটেছে'। আরও কিছু জানার জন্যে বললাম 'না তেমন কিছু নয় যা রেডিওতে শুনলাম তার বেশী আমি এখনও কিছু জানিনা'। তখন তার মুখেই শুনলাম যে, সে সকালে খবরটা শুনে কর্নেল সাফায়াত জামিলের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। যখন জানতে পারল যে, সবাই ১ম বেঙ্গলে তখন সেও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং এখন সে ওখান থেকেই ফিরছে। তার মুখ থেকেই শুনলাম সেখানে সেনা, নৌ ও বিমান প্রধান ছাড়াও উপ-প্রধান জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তারা এখন সবাই রেডিওর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। কমান্ডারও সেখানে ছিলেন তবে তিনি এবং সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ সেখানেই রয়ে গেছেন। এর মধ্যে ডালিম আর ফারুকও উপস্থিত হয়েছিল। ডালিম সকলকে সেখানে পেয়ে সমগ্র পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে ১ম বেঙ্গলের সৈনিকদের উদ্দ্যেশে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল, সে সময় কর্নেল সাফায়াত জামিল, কমান্ডার ৪৬ ব্রিগেড ডালিমকে ধমকের সুরে বলেন 'You do not have to address troops under my command moreover when the commanding officer is present in the battalion.' কমান্ডারের ধমকে ডালিম কিছুটা দমে যায়।

এর মধ্যেই উপস্থিত সকলকে জানানো হয় যে, খন্দকার মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি। ফারুক, রশীদ সেখানে উপস্থিত। তিন বাহিনী প্রধানদের রেডিও ষ্টেশনে নব নিযুক্ত রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণার জন্য যেতে বলে এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুঝাতে থাকে যে তারা যা করেছে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই করেছে এবং এর প্রয়োজন ছিল। তারা কেউই ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আক্রোশে কিছু করেনি। দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হলে বঙ্গবন্ধুকে অপসারণ করা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই করার ছিল না। জানিনা সেদিন তিন বাহিনী প্রধান তাদের এ ভাষ্য মনেপ্রাণে কতটা গ্রহণ করেছিলেন বা নিজেদের সামরিক নেতৃত্বের কি মূল্যায়ন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আর নেই, দেশে নেতৃত্ব নেই। শাসক আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত। আওয়ামী লীগে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচর রাষ্ট্রপতি হতে

চলেছেন যার পেছনে আওয়ামী লীগের অনেকেরই সমর্থন থাকা স্বাভাবিক। সর্বোপরি ডালিমের ঘোষণা মতে তার (মোশতাক) নেতৃত্বেই এ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। তা ছাড়া এত বড় একটা রক্তাক্ত রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেল কোন প্রতিবাদ ছাড়াই। রক্ষীবাহিনীর তরফ থেকেও কোন প্রতিরোধ নেই। সবই যেন এক নিমিশে মুছে গেল। এমতাবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেশকে আরও অনিশ্চিয়তা এবং রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারত যার ধাক্কা সামলাবার মত অবস্থা বা প্রস্তুতি সে সময়কার বাংলাদেশের ছিলনা। তাছাড়া যে কোনরূপ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সশস্ত্র বাহিনীকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিত যার চরম মূল্য হিসেবে দেশের সার্বভৌমত্বও হয়ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। হয়ত এতসব চিন্তার মধ্যে দিয়ে সেদিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধানগণ রেডিওতে গিয়েছিলেন খন্দকার মোশতাকের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করে রেডিওতে ভাষণ দিতে। তবে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানগণ এক তরফাভাবে যা করতে পারতেন সেটা ছিল তখনই এ অভ্যুত্থানকারী অফিসারদিগকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার করা বা তাদের নিষ্ক্রিয় করার প্রয়াস নেয়া। তবে তার পরিণতি কি হত তা হয়ত এখন বলা দুষ্কর। যাই হোক এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত মানসিক শক্তি, প্রশিক্ষণ আর অভিজ্ঞতা তখনকার সেনাপ্রধান বা অন্য বাহিনী প্রধানদের ছিলনা।

তবে এ পর্যন্ত অনেক লেখক ও ভাষ্যকারই সশস্ত্র বাহিনী প্রধানদেরকে তথাকথিত মেজরদের অভ্যুত্থানের পক্ষে এবং তাদের সামনে নত হবার কথা বলেছেন কিন্তু সে সময়কার পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারলে যে ব্যাপারটি সহজেই মনে হবে তা হল যে, অতি প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তখনকার পটভূমিতে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানগণ হয়ত সঠিক পদক্ষেপই নিয়ে ছিলেন। অন্যথায় সমগ্র সশস্ত্র বাহিনী আজ হয়ত ইতিহাসের কাঠগোড়ায় দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্টকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকত।

এ ছাড়াও আজ অনেক তর্ক বিতর্ক দেখা দিয়েছে বিশেষ করে তৎকালীন সেনাপ্রধানের ব্যর্থতা সম্বন্ধে। আজ এটা প্রতীয়মান যে, তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হলেও অতিদ্রুত মেজর হতে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে (৩ বৎসর সময়ের মধ্যে) শান্তিকালীন সময়ের একটি সেনাবাহিনীর প্রধান রূপে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তেমনি তার প্রধান স্টাফগণও দ্রুততার সাথে উপরে উঠে আসেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর

উচ্চতর পর্যায়ে সংকটময় সময়ে যে দৃঢ়তা ও দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তার মানসিক প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতা তেমনি ভাবে গড়ে উঠেনি। তাছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে Chain of command থাকার কথা সেখান থেকেই তাৎক্ষণিকভাবে কোন বাহিনী প্রধান বিশেষ করে সেনাপ্রধানকে কোন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। চেষ্টা করা হয়নি সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখার। যদিও তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি প্রয়াত সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ক্যাপটেন মনসুর আলী জীবিত ছিলেন। কেন তাঁরা সেদিন তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে পারেননি বা কেন পারেননি সেনা প্রধানকে বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টার সরকারি আদেশ প্রদানের বা কেউই এ ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব চিহ্নিত করতে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। তার কোন তথ্য আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অথবা সেনাপ্রধানের তরফ থেকে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার জন্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিনা তাও জানা যায় নি। যদিও সেনাপ্রধানের উপযাচক হয়ে এ ধরনের দিক নির্দেশনার জন্যে উপ-রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করার প্রয়োজন ছিলনা, যেখানে শাসনতন্ত্রেই রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণের উল্লেখ থাকে। অপর দিকে ঠিক এ ধরনের পদক্ষেপ ১৯৮১ সনে, জিয়া হত্যার পর নেয়া হয় যার ফলে সেদিন সমগ্র জাতি আর এক শাসনতান্ত্রিক সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং সেনাপ্রধানও সঠিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলেন। আমি মনে করি আজও যারা এ বিষয়টি নিয়ে শুধুমাত্র সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করছেন তারা যদি সমগ্র বিষয়টি সামগ্রিক আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেন তা হলে হয়ত বা অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হতে পারে। হালে অনেক বুদ্ধিজীবি, লেখক এমন কি বড় আমলারাও দেশের পটপরিবর্তনের সাথে সাথেই ১৫ই আগস্টে হত্যাকান্ডের বর্বরতা ও গণতন্ত্রের হত্যার কথা বলে থাকলেও সেদিন বা তার আরও পরেও কোন প্রতিবাদ করতে সৎসাহস করেননি এবং এর উল্টোটিই করতে দেখা গেছে। সেদিন প্রতিবাদ হিসাবে এমারজেন্সি সংসদ অধিবেশনের ডাক দিতে পারতেন উপ-রাষ্ট্রপতি সংবিধানে সংরক্ষিত পদাধিকারের বলে। বরং বেশীর ভাগ সদস্যই সল্প সময়ের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যোগাযোগ অথবা খন্দকার মোশতাককে সমর্থন দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর এটাও সত্য যে, সেনাপ্রধানের উপস্থিতিতে তার হয়ে অন্য কোন অধীনস্থ অফিসারের যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সেটা হত সেনারীতি বহির্ভূত। অপরদিকে সেনাপ্রধান যদি কোন অধীনস্থ কমান্ডারকে কোন কার্যকরি ব্যবস্থা

গ্রহণ করতে বলে থাকেন তবে সম্পাদন করা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ আর সাহায্য সহোযোগিতা করা তার দায়িত্বের মধ্যেই বর্তায়। অন্যথায় সেনাপ্রধান তার পদাধিকার বলে যে কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা রাখেন। এমনকি তিনি তার অধীনস্থ কমান্ডারকে সরিয়ে তার স্থলে অন্য কোন অফিসারকে নিযুক্ত করতে পারেন। সেদিন যদি সেনাপ্রধান তার কোন অধীনস্থ কমান্ডারকে কোন Executive Order দিয়ে থাকতেন আর তা পালনে সে কমান্ডার অপারগ হলে বা তার কার্যকলাপে এমনটা প্রতীয়মান হলেও তিনি সেদিন বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারতেন। বিশেষ করে যখন ১৫ই আগস্টে সেনা বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ করে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তারই (সেনাপ্রধান) অজ্ঞাতে।

যাই হোক না কেন বাস্তবে তিন বাহিনী প্রধানগণের আনুগত্য স্বীকার ছিল এ বিপ্লবের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন আর সেটা নিশ্চয়ই শুধুমাত্র খন্দকার মোশতাকের ভয়ে নয়, যেমনটা খন্দকার মোশতাক দাবী করেছেন। এ প্রসঙ্গে এনথনি ম্যাসকারনিহাস তার বই 'Bangladesh : A Legacy of Blood' এ খন্দকার মোশতাকের এ ধরনের দাবী তুলে ধরেছেন সেখানে জনাব মোশতাক আহমেদ বলেছেন যে, সশস্ত্র বাহিনী প্রধানগণ তার ভয়ে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস পাননি এবং তাদের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর ছিল না।[১]

খন্দকার মোশতাকের মত একজন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে বা সেদিনে সেই সন্ধিক্ষণে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানদের অন্য কোন সিদ্ধান্তের পরিণতি কি হতে পারত তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা যে ছিল না তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রহণ করতে না পারাটাই স্বাভাবিক। আর তার মত রাজনীতিবিদের এ ধরনের বক্তব্যের পিছনে আর যাই হোক অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে। তবে এটা সত্য যে, সেদিন যে লোকটি মনে প্রাণে এ অভ্যুত্থান এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে গ্রহণ করতে পারেননি তিনি ছিলেন ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার সাফায়াত জামিল। তবে তিনি সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধের আংশকায় তখনকার পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হন। সেদিন হতে ৩রা নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থান পর্যন্ত খন্দকার মোশতাককে বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নেননি। আর তার মনোভাব তিনি লুকিয়েও রাখতেন না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রকাশ্যে খন্দকার মোশতাককে Userper বলে আখ্যায়িত করতেন।

১। এনথনি ম্যাসকারনিহাস রচিত *'Bangladesh : A Legacy of Blood'* এর ৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মেজর গফ্ফারের মুখে ১ম বেঙ্গলে ঘটে যাওয়া সকালের বিবরণ শুনতে শুনতে অনেক সময় পার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ব্রিগেড কমান্ডার নিজের অফিসে এসে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি আর গফফার তার অফিসে গেলাম। প্রথম দর্শনেই তাকে আমার কাছে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হল। চোখে ক্লান্তি আর চেহারায় বিষন্নতার ছাপ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল। প্রথম কথাতেই বললেন 'I do not know where we are heading and what to do'.

কমান্ডারের অফিসে থাকতেই আমার অফিস রানার এসে জানালো যে, আমার একটা জরুরী ফোন এসেছে ধানমন্ডি থেকে। বুঝে উঠতে পারলাম না এ সময়ে ধানমন্ডি থেকে কে আমাকে খুঁজছে। কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে আমার অফিসে এসে ফোন রিসিভ করলাম। অন্য প্রান্ত থেকে মেজর বজলুল হুদা, অভ্যুত্থানকারীদের একজন, আমাকে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে সেখানে রক্ষিত ক্যামেরায় তোলা কিছু Unexposed film নিয়ে এসে তা সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে বা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে রাখতে অনুরোধ করল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এসব Film কয়েকটি পত্রিকা ও বিটিভি কর্তৃক ধারণকৃত যা তাদেরকে নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি। হুদার সাথে কথা শেষ করে আমি কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে Film আনার জন্যে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। জীপে বসে আমার ভিতরে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠল যা এখন সঠিকভাবে প্রকাশ করার মত ভাষা এবং সময়ের ব্যবধানে সে অনুভূতিগুলো সঠিকভাবে প্রকাশ করা যাবে বলে মনে হয়না।

দুই

গাড়ীতে বসে ভাবছিলাম মেজর বজলুল হুদার কথা। তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭৩ সনে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন আমি কুমিল্লায় ১ম আর্টিলারী ইউনিটে নিয়োজিত হই। তখন সে এডজুডেন্ট। হুদা আমার থেকে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অফিসার। মুক্তিযুদ্ধের কোন এক পর্যায় হুদাও ডালিমের সাথে পাকিস্তান থেকে পালয়ন মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং ২ বছরের জ্যেষ্ঠতা পায়। ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের পূর্বে সে সেনাসদরে সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তরে নিয়োজিত ছিল। কয়েকদিন পূর্বেও তার সাথে আমার দেখা হয় সেনানিবাসে। বেশ কিছুদিন পূর্বে সে আমার বাসায় আসে এবং অনেকক্ষণ থেকে চলে যায়। আমার মনে পড়ল যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ১ম আর্টিলারী ইউনিটকে রাষ্ট্রপতির বাসভবনের পাহারায় সেনাসদর থেকে নিয়োজিত হয় আর সে জন্যে ১ম আর্টিলারীর প্রায় এক কোম্পানী সমপরিমাণ সৈনিকদের কুমিল্লা থেকে ঢাকায় আনা হয়। যেহেতু এরা ঢাকার বাইরের সৈনিক তাই তাদের যাবতীয় দায়িত্ব বর্তায় ঢাকা লগএরিয়ার অধীনস্থ ঢাকা ষ্টেশন হেড কোয়ার্টারের। তখন ষ্টেশন কমান্ডার ছিলেন লেঃ কর্নেল হামিদ (অবঃ)। প্রসঙ্গত তখন রাষ্ট্রপতির জন্য এখনকার মত পৃথক কোন গার্ড রেজিমেন্ট ছিল না। আমি বুঝতে পারলাম হুদার যোগাযোগটা এ ঘটনার সাথে আর্টিলারী ইউনিটের মধ্যে সেই জড়িত। আর তাদেরই ডিউটি পড়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে সামরিক প্রহরার জন্য যেখানে তিনি সপরিবারে থাকতেন। যেহেতু হুদা আর ডালিম মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংগঠিত এ রেজিমেন্টের সাথে যুদ্ধ থেকেই চাকুরি করেছে, স্বভাবতই প্রায় সমস্ত সৈনিকই তাদের অনুগত ছিল। আমার এ ধারণা আরও পোক্ত হল যখন আরও পরে হুদার মুখেই শুনেছিলাম যে, ১৫ই আগস্ট ভোরে হুদাই এসে পাহারারত সৈনিকদের তাদের করণীয় সম্বন্ধে বুঝায়। সন্দেহ আরও দূর হল যখন বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর গেটে পৌঁছার পর হুদা আমার পরিচয় সৈনিকদের জানিয়ে প্রধান ফটক খুলে দিতে বলে। হুদা আর মেজর পাশা (অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী আর একজন অফিসার) সম্পর্কে শ্যালক ভগ্নিপতি।

আমি সেনানিবাসের প্রধান ফটক পেরিয়ে, যা থার্ডগেট নামে পরিচিত, এয়ারপোর্ট রোডে (বর্তমানে ভিআইপি রোড) উঠে দেখলাম সমস্ত রাস্তা জনমানব শূন্য, কোথাও কোন গাড়ী চলছেনা। কেবল মাত্র কিছু কৌতূহলী মানুষ কোন সামরিক গাড়ী বের হলেই উঁকি মারছে। দু'একজন যাকেই রাস্তায় দেখলাম বেশ হতভম্ব আর আতঙ্কগ্রস্ত। মনে হল ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল জনতা ঘরের বাইরে আসতে সাহস সঞ্চয় করতে পারছেননা। সেনাবাহিনীর গাড়ী দেখে বেশ সংকিত মনে হল। জনমানবহীন রাস্তা ঘাট দেখে মনে হল কেমন যেন এক অজানা আশংকা আঁচ করছে।

আমার গাড়ী ফার্গগেট হয়ে মানিক মিয়া এভিনিউ হয়ে মিরপুর রোডের মাথায় আসতেই দেখতে পেলাম দুটো ট্যাংক রাস্তার দু' পাশে বর্হিমুখি হয়ে অবস্থান নেয়া। ট্যাংকের মেশিনগানগুলো সমান্তারাল ভাবে রাস্তার দিকে তাক করে রাখা। মেশিনগান সদস্য সদা প্রস্তুত অবস্থায়, চেহারায় আত্মতৃপ্তি, মুখে এক রকম বিজয়ের হাসি। আমার চোখে চোখ পড়তেই কোন রকমের দায়সারা গোছের অভিবাদন জানাল তা দেখে আমার মনে হল যেন রাতারাতি সেনাবাহিনীতে যতটুকু শৃংখলা দেখেছি তার থেকে চরম অবনতি ঘটেছে। আর এ অবস্থায় যেখানে এসব সৈনিক বঙ্গবন্ধুর মত বিশাল ব্যক্তিত্বকে স্বপরিবারে হত্যা করার সাহস রাখে সেখানে তাদের কাছ থেকে কতটুকুই বা শৃংখলা আশা করা যায়। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অভ্যুত্থানে যে সমস্ত অফিসার ও সৈনিক, সৈনিক শৃংখলা আর Chain of Command ভঙ্গ করেছে তার জের সমগ্র সেনাবাহিনীর উপরে পড়তে বাধ্য আর এর পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক ও সুদূর প্রসারি হতে বাধ্য এবং পরের বেশ কতগুলো পরপর ক্যু কাউন্টার ক্যু তার প্রমাণ দেয়। সেনা নিয়ম ভঙ্গ করে Revolt করা যায় বা Revolt ও Chain of Command ভঙ্গ করে ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় তবে তা সশস্ত্র বাহিনীর মত একটি সংগঠনের জন্য পরবর্তীতে আরও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। তাই পৃথিবীর সকল সশস্ত্র বাহিনীতে Chain of Command ভঙ্গ করা বা Revolt করা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ এবং এর জন্যে চরম শাস্তির বিধান রয়েছে। আর এ ধরনের কার্যকলাপের, তা যত মহৎ উদ্দেশ্যেই হোক এর বিরুদ্ধে কার্যকরি ব্যবস্থা না নিলে বারংবার এ ধরনের গর্হিত কাজ করার প্রবণতা থাকে যা বাংলাদেশের বেলায় ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট এবং তার পরবর্তী অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান, ক্ষমতা দখলের প্রয়াসই প্রমাণ করে। সামরিক ইতিহাস এ বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষীতে ভরা।

ট্যাংকগুলো পেরিয়ে ধানমন্ডি লেকের ধার ধরে এগিয়ে যেতেই ৩২নং রোডে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে সৈনিকদের জটলা দেখতে পেলাম। সেখানে প্রায় সব সৈনিকই আর্মাড ট্যাংক এবং আর্টিলারী কোরের । বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে পাহারারত কিছু পুলিশও ছিল। বুকের ভিতর এক অজানা, কিছুটা ভয়, অনুভূতি উত্তেজনা আর প্রচন্ড একটা দুঃখ সব মিলিয়ে এক অনুভূতির জন্ম নিল। এমনি অনুভূতি নিয়ে কখন যে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে জীপটি দাঁড়ালো টেরও পেলাম না। গাড়ীর ভিতরে বসে বাড়ীর দিকে তাকালাম। এই আমার জীবনে প্রথম এ ঐতিহাসিক বাড়ী দর্শন। অত্যন্ত সাধারণ কাঠামোর একটি অসম্পূর্ণ তিন তলা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের বাড়ী। প্রায় সম্পূর্ণ প্লটেই বাড়ীখানা নির্মিত। ধানমন্ডির অন্যান্য বাড়ীর তুলনায় নিতান্তই ছোট জায়গার উপরে তৈরী। এর আশে পাশের বাড়ীগুলোও প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। বাড়ীগুলো এত ঘন যে, রাষ্ট্রপতির সামান্য নিরাপত্তা দেয়াও এখানে দুরূহ ব্যাপার । এই সেই বাড়ী যেটা বাংলার ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রতিটি সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সেই জায়গা যেখান থেকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন এবং এখান থেকে পাকবাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে দীর্ঘ নয় মাস বন্দী জীবন যাপন করেন। এ সম্পূর্ণ বাড়ীটাই এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের ইতিহাস। এখানে বা এর আশে পাশে সৈনিকদের অকস্মাৎ আগমন নতুন নয়। বহুবার পাক সেনারা এ বাড়ী অবরোধ করেছে আর বাড়ীর বাসিন্দারা হয়েছিলেন অবরুদ্ধ। কিন্তু আজ এখানে বসবাসরত পরিবারের সকলেই নিস্তব্ধ শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর কন্যাদ্বয় ছাড়া যারা সেদিন কপাল জোরেই দেশের বাইরে থাকাতে প্রাণে বেঁচে যান। হয়তবা ইতিহাস তাদের কাছ থেকে আরও কিছু পাবে বলে।

গেটের বাইরেই আমাকে গাড়ী রাখতে হল কারণ গেটের ভেতরে গাড়ীর গ্যারেজ এত সল্প পরিসরে যে আর একটি গাড়ী রাখা অনেকটা অসুবিধাজনক। জীপ থেকে নেমে হেঁটে সোজা ভিতরে ঢুকতেই পোড়া বারুদের গন্ধ আমার নাকে এল। গ্যারেজের পাশ কেটে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের মুখে আমার সুপরিচিত একজন অফিসার সাহায্যে এগিয়ে এসে আমার হাতে তিনটি ফিল্ম রোল দিল। দেখলাম একটি বিটিভির আর দুটি স্টিল ফিল্ম একটি ইত্তেফাক পত্রিকার আর একটি পত্রিকার নাম মনে করতে পারছিনা। এ ছবিগুলো তখন কিভাবে তোলা হল জানতে চাইলে ঐ অফিসার আমাকে জানালো অভ্যুত্থানের

পরে পরে এই তিন সংস্থার ক্যামেরাম্যানদেরকে ডেকে নিয়ে এসে ভেতরের ফটো তুলতে বলা হয়েছিল। পরে কোন অজ্ঞাত কারণে এগুলো তাদেরকে নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি । এর বিশদ কারণ জিজ্ঞেস করতে হয়নি। আমি নিজেই বুঝতে পারলাম কেন দ্বিতীয় চিন্তায় এগুলো নিয়ে যেতে বারণ করা হয়েছিল।

ফিল্মগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গ্যারজের দিকে তাকাতেই দেখলাম আমার অত্যন্ত পরিচিত লাল রংয়ের একটি Prince গাড়ী দাঁড় করানো। একটু সামনে গিয়ে গাড়ীর ভেতরে উঁকি মারতেই দেখলাম পিছনের সিটে উবু হয়ে পড়ে থাকা একটি মৃত দেহ। আমার অন্ত্যন্ত পরিচিত, ঘনিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী ও হিতাকাঙ্খী এবং বঙ্গবন্ধুর প্রাক্তন নিরাপত্তা প্রধান কর্নেল জামিল আহমেদ। পরণে একটি সাফারী স্যুট, বুলেট বিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ। নিজের অজান্তেই আমার চোখে পানি এলো। এই প্রথম আমি একজন অতিপরিচিত কাছের মানুষের মৃতদেহ এতকাছ থেকে দেখলাম যদিও তার হত্যার খবর আগেই পেয়েছিলাম। মানসপটে ভেসে উঠল কর্নেল জামিলের সদাহাস্য উজ্জ্বল মুখখানি। বেদনায় হৃদয়ে কুকরে উঠল। আমার পাশে দাঁড়ানো অফিসারটি বলে উঠল, 'স্যারের বোকামী আর জেদের জন্যই নিজের জীবন দিতে হল।' আমি জানতে চাইলাম, কিরকম জেদ আর বোকামী তিনি করেছিলেন? জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু যে কয়জনকে সে সকালে তার বাড়ী আক্রমণ হওয়ার পর ফোন করেছিলেন তার মধ্যে জামিল একজন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি তাঁর বাড়ীর দিকে নিজের গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে যান।পথে সোবহানবাগের মসজিদের মোড়ের নিকট তাকে বিদ্রোহী সৈনিকরা বাধা দেয়। তিনি নিজের পরিচয় দিলে তাকে আর এগুতে বারণ করলে তিনি তার কর্তব্যের কথা বলে এগুতে চান নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও। এ কর্তব্য পরায়ন সৈনিক ফিরে যেতে না চাইলে তাকে গুলী করার হুকুম দিল সেখানে দাঁড়ানো কোন এক সৈনিক পিছন থেকে তাকে গুলী করে হত্যা করে। এ ঘটনা ঘটে সকাল প্রায় ৫টা ৩০ মিনিটে। পরে গাড়ীসহ তার মৃতদেহ বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর গ্যারেজে নিয়ে আসা হয়। তখন পর্যন্ত তার পরিবারের কাউকে মৃতদেহ নিয়ে যেতে অনুমতি দেয়া হয়নি। কর্নেল জামিল নিজের জীবন দিয়ে একজন সামরিক অফিসারের কর্তব্য পরায়নতা, আনুগত্য এবং শৃংখলার যে নজীর রেখে গেলেন তার তুলনা এদেশে পাওয়া দুস্কর। এ রকম কর্তব্যের খাতিরে আরও একজন অফিসার, লেঃ কর্নেল আহসানের সাথে আরও দুজন অফিসার, ১৯৮১ সনের ৩০ মে রাত্রে রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমানের সাথে নিহত হন আর এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজে। এ কয়জন অফিসার তাদের শপথ বাক্যের প্রতিটি শব্দ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। 'That I shall go whereever my superior orders me even at the peril of my life.' তবুও এদের মধ্যে কর্নেল জামিলের আত্মত্যাগ ছিল ভিন্ন ধরনের। এমনকি তার ড্রাইভারও এক পর্যায়ে বিদ্রোহী সৈনিকদের ভয়ে তাকে ছেড়ে গাড়ীটি চালু অবস্থায় রেখে চলে যায়। অথচ তার মৃত দেহটাও তার পরিবার ১৫ই আগস্ট রাত পর্যন্ত তাদের কাছে নিতে পারেনি।

কর্নেল জামিল আহমেদ কিছু দিন আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার ছিলেন। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগমনের পরপরই তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। মাত্র কিছু দিন পূর্বে তার প্রমোশন অনুমোদন হওয়ায় তিনি সশস্ত্র বাহিনী গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান হয়ে ব্রিগেডিয়ার (প্রয়াত) রউফের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা ছিল এবং তিনি সে অনুযায়ী তার স্থলাভিষিক্ত লেঃ কর্নেল হারুন আহমেদ চৌধুরীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু নিয়তি তা হতে দেয়নি। তিনি বঙ্গবন্ধুর ডাকেই তাঁরই জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। পরে জামিল আহমেদের অগ্রজ জনাব জালাল আহমেদের নিকট হতে জানতে পারলাম তিনি গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে জামিলকে যখন টেলিফোন করে ঘটনা জানতে চাইলেন ঠিক সে মুহূর্তে জামিল বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন কল পেয়েই ত্বরিত গতিতে ছুটে যান বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর দিকে। তারই বর্ণনা থেকে জানা যায় বঙ্গবন্ধু যখন কয়েকজন ব্যক্তি যার মধ্যে সেনাপ্রধান, জনাব তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ এবং অন্যদের টেলিফোনে তাঁর বাড়ী আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দিয়েও কোন ত্বরিত সাহায্য পেলেন না তখন তিনি জামিলকে ফোন করে আসতে বলেন। বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি অশ্রুসজল চোখে নিজের গাড়ী নিয়ে ধানমন্ডি ৩২নং রোডের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়ে যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে চাই, জামিলের জায়গায় প্রধান নিরাপত্তা অফিসার হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সাফায়াত জামিলকে পছন্দ করেছিলেন। তবে সাফায়াতের মতামত চাওয়া হলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে জানান যে, তিনি ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে থাকতে চান এবং বঙ্গবন্ধুও তার মতামত গ্রহণ করেন। এ কথা সাফায়াত জামিল তার প্রস্তাবিত নিয়োগের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পর পরই আমাদেরকে জানান।

আমি কর্নেল জামিলের গাড়ীর কাছে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে পারব না। এই ছোটখাট গড়নের সুদর্শন, সদাহাস্যোজ্জ্বল সেনা অফিসার ১৯৫৬ সনে

পাকিস্তান সিগন্যাল কোরে কমিশন প্রাপ্ত হন। তিনি চাকুরিতে সফিউল্লাহ ও জিয়ার সিনিয়র ছিলেন। অন্ত্যন্ত কর্তব্য পরায়ন ও দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল তার। মনে পড়ে জামিল পরিবারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭০ সনে লাহোরে (পাকিস্তান) তিনি তখন Corps Headquarter এ জিএসও-২ ইন-টেলিজেন্স ছিলেন। তার এবং তার সহধর্মীনির অমায়িক ব্যবহার আর অতিথি পরায়ণতার কথা যারাই তাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এক বাক্যে স্বীকার করবেন। আর তাদের এ ব্যবহারের জন্যই আমরা লাহোরে চাকুরিরত কয়েকজন তরুণ অফিসার অনেক বেশী ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ পাই। প্রায়ই তার বাসায় আমাদের জন্য মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করা হত। এমন কোন দিন ছিলনা যেদিন তার বাসায় গিয়ে না খেয়ে এসেছি। আমি তখন থেকেই দেখেছি বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষের জন্য তার অন্তরের বেদনা। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম আর বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছিল তার গভীর সমর্থন আর শ্রদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর অসোহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও আমরা তার বাসাতেই একত্র হয়ে আমাদের দেশ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত দূরে বসেও উৎকণ্ঠার সাথে আলোচনা করতাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রায়ই দেখতাম তার বাড়ীর চারপাশে পাক গোয়েন্দাদের আনাগোনা। একদিন তাকে আমি সতর্ক করলে তিনি সাহাস্যে বললেন, 'ওদের বেতন হালাল ত করতে হবে'। এর কিছুদিনের মধ্যে তাকে কোয়েটায় বদলি করা হয় আর আমিও তখন লাহোরের বাইরে। আরও মনে পড়ল মাসখানেক আগে তার সাথে আমার শেষ দেখা গণভবনে তার অফিসে। আমি কোন কাজে গণভবনে গেলে তার অফিসে বসে থেকেই তাকে অনুরোধ করলাম আমাকে বঙ্গবন্ধুর সাথে ক্ষণিকের দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য যদিও তাঁকে (বঙ্গবন্ধুকে) আমি বহুবার দূর থেকেই দেখেছি। সেদিন অফিস শেষে বঙ্গবন্ধু বাড়ীতে ফেরার পথে তার অফিসের সামনেই জামিলের সৌজন্যে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার জীবনের প্রথম ও শেষ কথা বলার সৌভাগ্য হয়। কয়েক মিনিটের কথা বলার ফাঁকে আমার স্ত্রীর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বাইরের কলেজ থেকে বদলি ভর্তির সমস্যা জানালে তিনি জামিলকে সাহায্য করার কথা বলেন। দুর্ভাগ্য যে, সেটা তাঁর জীবিত অবস্থায় আর হয়ে উঠেনি।

ভাবছিলাম এ কর্তব্যপরায়ণ লোকটি তার সৈনিক জীবনের শেষ কর্তব্যটুকুও পালন করে গেলেন। জানিনা বাংলাদেশের ইতিহাস এই ত্যাগের কি মূল্যায়ন করবে। কারণ তিনি বঙ্গবন্ধুর ডাকে প্রাণ বিসর্জনকারী একমাত্র অরাজনৈতিক বেতনভূক কর্মচারী অথচ বঙ্গবন্ধু তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সঙ্গীদেরকেও

ডেকে ছিলেন কিন্তু সেদিন প্রাণের ভয়ে কেউই সাড়া দেননি। কর্নেল জামিলের মৃতদেহ এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরেকবার আমি ও কর্নেল নুরুদ্দীন খান (পরে সেনা প্রধান অবঃ) এখানে আসি কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুমোদন না পাওয়ায় জামিলের অগ্রজ জালাল সাহেবের লাল মাটিয়ার বাসায় গিয়ে শোক সন্তপ্ত পরিবারের সাথেও দেখা করি।

জামিলের মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে নীচের তলার প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়াতেই আমার সাথে যে অফিসারটি ছিল সে আমাকে ভেতরে ঢুকে পুরো বাড়ী ঘুরে দেখে আসতে বললো। তখন আনুমানিক বেলা ৯টা। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড শেষ হয় ভোর আনুমানিক ৫-৩০ মিনিটের মধ্যেই। আমাকে সাথে নিয়ে সমস্ত বাড়ী ঘুরে দেখাবার দায়িত্বও সে নিল। প্রসঙ্গতঃ এই অফিসারই বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে পাহারারত ১ম আর্টিলারী ইউনিটের সৈনিকদের কমান্ডার ছিলো যিনি রাতে সেনানিবাসে অফিসার মেসে থাকত। ভোরের দিকে তাকে নিয়ে এসে বাড়ীর চার্জ দেয়া হয় (যেহেতু তিনি এখনও চাকুরিরত তাই তার নাম উল্লেখ করা হল না)। যেতে যেতে সে আমাকে জানালো, সকাল থেকে এ পর্যন্ত আমিই প্রথম সামরিক অফিসার (অভ্যুত্থানে জড়িত অফিসাররা বাদে) যাকে প্রথম বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে ১৯৯৪ সনের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে দৈনিক আজকের কাগজে লেঃ কর্নেল হামিদ, যিনি এ অভ্যুত্থানের উপর লিখেছিলেন দাবী করেন যে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি ২-৩০ মিনিট ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে যান, আমি এর একটি প্রতিবাদ পাঠাই যা 'আজকের কাগজে' ছাপানো হয়।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর ভেতর দেখার প্রস্তাব শুনে কেন জানিনা মনে এক সংশয়ের জন্ম দিল; ভিতরে যাব কি যাব না। পরে ভাবলাম যেয়ে দেখটাই সমীচীন হবে কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের এ রক্তাক্ত অধ্যায়ের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনার শেষ অংকটির যবনিকা পড়ার পরেও দেখতে পারাটা একটা ঐতিহাসিক সত্য হয়ে সারা জীবন থাকবে। তাই কিছুটা যন্ত্রচালিতের মত দরজার বাইরের কলাপসিবল গেট পার হয়ে সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই আমার হৃদপিন্ডের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। নাকে মৃত্যুর গন্ধ বারবার পাচ্ছিলাম। বারুদের গন্ধ আর মৃত্যুর নিস্তব্ধতা মিলে অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করছিল। অন্তরে ভীষণ বেদনা আর শরীরে বিষন্নতা গ্রাস করতে লাগল। সব মিলিয়ে মনে হল এক মৃত্যুপুরির মধ্যে এসে পড়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের জাতির জনক আর রাষ্ট্রপতির বাড়ীর

এ গেট দিয়ে ঢুকতে অনেকেরই সৌভাগ্য হয়নি। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক যার সান্নিধ্যে বা কাছে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত আর আজ এ মুহূর্তে সেই বাড়ীর ভেতরে মৃত্যুর নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ভাগ্যের কি নির্মম খেলা যার তর্জনী হেলনে বাংলার মানুষ জীবন দিতেও কার্পণ্য করেনি তারই মৃতদেহ দেখার জন্য নেই কোন ভীড়, নেই কোন জনসমুদ্র, নেই কোন ক্রন্দন, মরসিহা বা মাতম।

ভিতরে ঢুকতেই সিঁড়ির গোড়ার রুমে সেদিন রাতে ডিউটিরত পুলিশ ইন্সপেক্টরের মৃতদেহ সামনের টেবিলের উপর রক্ষিত টেলিফোনগুলোর উপরে উবু হয়ে পরে থাকতে দেখি। টেবিলটি রক্তে রক্তে একাকার হয়ে গেছে। পরে জানতে পারলাম বাড়ীর ভেতরে প্রবেশের মুখে কলাপসিবল গেটের তালার চাবি দিতে অস্বীকার করায় তালা ভেঙ্গে ফেলার পর প্রথমেই তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়। ইউনিফর্ম পরা এই পুলিশ অফিসার আর একজন ব্যক্তি যিনি নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। জানিনা এ অজানা পুলিশ অফিসার কোনদিন বাংলার ইতিহাসে স্থান পাবে কিনা, না হারিয়ে যাবে তার নাম, নাম না জানা এ দেশের অগণিত শহীদদের মত। ইতিহাসে স্থান পাক আর না পাক একজন পুলিশ অফিসার রেখে গেলেন কর্তব্য পালনের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে হাঁটছি। একটু এগুতেই সিঁড়ির ডান দিকে আর একটি বোধ হয় গেস্টরুম ছিল। ভিতরে ঢুকে সেখানে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের আর তার এক সহকারীর বুলেটবিদ্ধ মৃত দেহ। শেখ নাসেরের মৃত দেহ বাথরুমের দরজার সামনে পড়ে আছে। মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ। শেখ নাসের আগের দিন খুলনা থেকে এসেছিলেন জনাব সেরনিয়াবাদের মেয়ের গায়ে হলুদ উপলক্ষ্যে। তিনি সেদিন হয়ত জানতেন না এটাই তার ঢাকায় শেষ যাত্রা। একেই বোধ হয় বলা হয় Appointment with death. এই শেখ নাসের সম্বন্ধে অনেক কিছুই এর আগে শুনেছি। আজ তিনি সবকিছুরই উর্ধ্বে চলে গছেন। তাড়াতাড়ি সে রুম থেকে বের হয়ে উপরের তলায় উঠার সিঁড়িতে উঠলাম। সিঁড়ির মাঝামাঝি এসেই সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখলাম যা আজও বিষদভাবে স্পষ্ট মনে পড়ে। আর সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর নিষ্প্রাণ দেহ সিঁড়ির উপরে পড়ে থাকতে দেখা। মনে পড়ে ১৯৫৬ সনে আমি তখন নিতান্তই বালক তখন জীবনে প্রথম তৎকালীন যুবলীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখি রংপুরে যুব উৎসবে যোগদান করতে সেখানে আগমনের সুবাদে।

আমার বাবা তখন রংপুরে সরকারি চাকুরি করতেন। আমি রংপুর জেলা স্কুলে পড়তাম। তিনি এসেছিলেন আমাদের বাড়ীওয়ালার দাওয়াতে। সেখানেই প্রথম দেখলাম একজন প্রাণবন্ত সুপুরুষ বাঙালী, উঠতি রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমানকে। আর আজ ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সন, তাঁরই বাড়ীর দোতলার সিঁড়ির মধ্যধাপে নিঃস্প্রাণ সুঠাম দেহী বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বুলেট বিদ্ধ মৃতদেহ, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, পরণে চেক লুঙ্গি, ডান হাত বুকের উপরে বা হাত ঈষৎ এলানো। কিছু দূরে ছিটকে পড়া তার ব্যবহৃত চশমা। বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলীর আঘাতে। সিঁড়ির উপরে চাক চাক রক্ত জমাট বাধা। মুখমন্ডল তেমনি শান্ত। কোথাও কোন ভয়ের চিহ্ন নেই। দেখে মনে হল মৃত্যুর ছায়াও তার মুখে পড়ে নি। তার চেহারার অভিব্যক্তিতে মনে হল তিনি তারই পরিচিত কাউকে সামনে দেখেছিলেন যাকে দেখে হয়ত তিনি বিশ্বাসও করতে পারেননি যে এদের হাতেই তাকে বরণ করতে হবে এক অবিশ্বাস্য রকমের মৃত্যু। স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙালী সৈনিকদের গুলীর আঘাতে তাঁর জীবনের ইতি হবে একথা তিনি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা কল্পনাও করেননি। তাঁর মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানি সৈনিকদের গুলীতে কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের সে সাহস হয়নি। তিনি বেঁচে ছিলেন বাংলার মানুষকে স্বাধীন করে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরই নিজের বাড়ীতেই মৃত্যুবরণ করার জন্য।

বঙ্গবন্ধুর দেহের অবস্থান দেখে মনে হল সামনের দিক থেকে গুলী করা হলে সাধারণত উপর থেকে নিচের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ার কথা কিন্তু তাঁর শরীর চিৎ অবস্থায় কেন। পরে জানতে পারলাম তিনি সিঁড়ির উপরেই ছিলেন এবং গুলী হয়েছে First Landing থেকে। মুখ থুবড়েই পড়েছিলেন। অতি উৎসাহি অভ্যুত্থানকারী সৈনিকরা তাঁর দেহকে চিৎ করে দেয় তাঁকে দেখার জন্য।

বঙ্গবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। এই সেই ব্যক্তিত্ব যাঁর বিশালতা প্রকাশ পায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা লগ্ন থেকে। এই সেই ব্যক্তিত্ব যিনি মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন ১৯৪৭ সন থেকেই যার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যখন তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যাখান করেছিলেন, একমাত্র উর্দু হবে রাষ্ট্র ভাষা। আর সেই থেকে শুরু হয় দীর্ঘ সংগ্রাম বাংলার ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাবরণ করতে হয় বহুবার। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে প্রধান আসামী করা হয় বাঙালীর ন্যায্য পাওনার কথায় সোচ্চার হওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এশিয়ার ষ্ট্রং ম্যান

বলে কথিত আইয়ুব খানও তাঁকে জেলের শলাকার পেছনে ধরে রাখতে পারেন নি। ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল আইয়ুব খানের জেল। সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এক কথায় যার জীবনের সুন্দর সময়গুলোই কাটে লৌহ শলাকার পেছনে আর নির্যাতিত হতে হয় বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য। এ ধরনের নেতার জন্ম বার বার হয় না। আমার মনে পড়ে ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ সন, যেদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার মা-টিতে পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন সেদিনকার অনুভূতি। আমি তখন হাজার মাইল দূরে পাকিস্তানের শিয়ালকোট রণাঙ্গনে এক অসহায় অবস্থায় আমার বাংকারে বসে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের ধারা বিবরণী শুনছিলাম আর ভাষ্যকারের বিবরণ শুনতে শুনতে আনন্দে আর স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার গর্বে আর এ মহৎ নেতার আত্মত্যাগের কৃতজ্ঞতায় আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। আমার বাংকারে বসা এক বাঙালী সৈনিক, হাবিলদার আবু সাঈদ আনন্দে ডুকরে ডুকরে ক্রন্দনরত স্বরে বলল যে, আমরা কোন দিন দেশে ফিরে যেতে পারব কিনা। আমি তাকে শান্ত করে বলার চেষ্টা করলাম, যে নেতা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঙালীকে একটি জাতিসত্তা দিতে পারেন তিনি থাকতে পাকিস্তানীরা আমাদের কেশা গ্রও স্পর্শ করতে পারবেনা। এ রকম বিশ্বাস আমার একার নয় পাকিস্তানে আটকে পড়া সকল বাঙালীরই ছিল বলে আমার ধারণা । আমার এ কথায় সেদিন আশ্বস্ত হল সাঈদ।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমরা অনেক গর্ব করেছি। এক অকুতভয় বাঙালী নেতা হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। যখন ১৯৭০ সনের নির্বাচনের রেজাল্ট দেয়া হচ্ছিল তখন আমরা, সমস্ত বাঙালীই মনে প্রাণে বঙ্গবন্ধু আর আওয়ামী লীগের বিজয় কামনা করেছি। আর বিজয়ের পরে গর্ব বোধ করেছি।

সেই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত দেহের পার্শ্বে দাঁড়ানো আমি। এক অশ্বস্তিকর সময় অতিক্রান্ত করছিলাম। বঙ্গবন্ধু, যাকে জাতির পিতা হিসেবেই জেনেছিলাম, তার মৃতদেহ এভাবে অযত্নে পড়ে আছে যার ভাগ্যে একটা চাঁদরও জুটলোনা দেহ ঢাকার জন্য, যার নাকি প্রাপ্য ছিল জাতীয় পতাকার মর্যাদা। কি দুর্ভাগ্য তাঁর, আর দুর্ভাগা এদেশের মানুষ আর আমরা, যারা জাতীয় বীরদের সামান্যতম মর্যাদা দিতেও কার্পণ্য করি।

বঙ্গবন্ধুকে কে কোন পরিস্থিতিতে গুলী করেছিল তা সঠিকভাবে তখন জানতে পারিনি আর সঠিকভাবে কোনদিন জানা যাবে কিনা জানিনা। তবে

এনথনি ম্যাসকারনিহাসের 'Bangladesh: A Legacy of Blood' বইটিতে তিনি যে তথ্য উৎঘাটিত করেন সে বর্ণনা থেকে যানা যায় যে, মেজর হুদা, মহিউদ্দিন এবং নুর শেখ সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করার পর মহিউদ্দিন সিঁড়ির উপরে উঠতে গিয়ে শেখ সাহেবের সামনা-সামনি হন। শেখ সাহেব তখন উপর থেকে নিচে নামছিলেন। যদিও মেজর মহিউদ্দিন মুজিবকে হত্যা করার নিয়তে যাচ্ছিল কিন্তু জীবনে প্রথমবার মুজিবের সামনা - সামনি পড়াতে এবং তাঁর অবিচল চেহারা আর ব্যক্তিত্ব দেখে কিছুটা ভড়কে যায় প্রায় তোতলানো ভাষায় বলে 'স্যার আপনি আসুন'। উচ্চকণ্ঠে মুজিব বলেন, 'তোমরা কি চাও, তোমরা কি আমাকে মারতে এসেছ? এটা ভুলে যাও। আমাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মারতে পারেনি তোমরা আমাকে মারবে এ চিন্তা করলেই বা কিভাবে।' মুজিব এদের সাথে কথোপকথন বাড়াতে থাকলেন শুধুমাত্র এ আশায় যে হয়ত যাদের তিনি ফোন করেছিলেন তাদের তরফ থেকে কোন না কোন সাহায্য এসে পৌঁছবে। মহিউদ্দিন বারবার একই কথা বলে যাচ্ছিল 'স্যার আপনি আসুন' এবং প্রত্যেকবার মুজিব কথা বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মেজর নুর স্টেনগান হাতে উপস্থিত হয় এবং সগোক্তিতে কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু বোঝা যায় না। মহিউদ্দিনের অপরাগতা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে স্টেনগান দিয়ে মুজিবের বুকের ডান দিক ঝাঁঝরা করে দেয়, গুলী খেয়ে মুজিব পেছন দিকে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। হাতে তাঁর প্রিয় পাইপটি তখনও ধরা ছিল। সম্ভবত তখন সকাল আনুমানিক ৫টা ৪০ মিনিট। ১৯৭৫ সনে ১৫ই আগস্ট মুজিবের বাঙালীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার অন্ত হয়। এনথনি ম্যাসকারনিহাস আরও লিখেছেন যে, ফারুকের সাথে কথা বলার সময়ে সে (ফারুক) তাকে (এনথনি) বলে যে মুজিব একজন বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী নেতা ছিলেন আর মহিউদ্দিন তার সামনে সম্পূর্ণভাবে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল আর সে সময়ে যদি মেজর নুর না পৌঁছত তবে যে কি হত বলা কঠিন ছিল। মুজিবের উপর গুলীর আওয়াজ শুনে বেগম মুজিব বেডরুমের বাইরে আসতেই দরজার সামনে তাকে হত্যা করা হয়। পরে একে একে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে হত্যা করা হয়। ছোট্ট রাসেল ভয়ে আলমারির পিছনে লুকিয়ে আকুতি মিনতি করেও রক্ষা পায়নি। তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

মেজর মহিউদ্দিনের জড়িত থাকার কথা আমি আগেও শুনেছিলাম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। এ হালকাপাতলা গড়নের অফিসারটি প্রত্যাগমনের পর

আর্মি সাপ্লাই কোর থেকে ট্যাংক রেজিমেন্টে যোগদান করে। ট্যাংক রেজিমেন্ট (আর্মারড কোর) এ যোগদানের কয়েকদিন পূর্বে আমার বাসায় তার সাথে দেখা হয় । তখন ভাবতেও পারিনি সে এমন একটা কান্ড করতে পারে। মেজর নুর তখন অবসর প্রাপ্ত। খুব বেশী পরিচিত নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অফিসারটি তখনকার সর্বাধিনায়ক কর্নেল এমএজি ওসমানির (পরে জেনারেল) এডিসি ছিল।১

আমি বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহের সামনে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। বুকের ভিতরে কেমন একটু অস্থিরতা লাগছিল। উপরে উঠতে হলে বঙ্গবন্ধুর মৃত দেহকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে যা খুবই অমর্যাদাজনক হবে মনে করে কোন রকমে দেয়ালের সাথে ঘেঁষে উপরে চলে আসলাম শেখ সাহেবের শয়নকক্ষের দিকে। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শয়নকক্ষ। তাতে একটি ডাবল খাট পাতা, পাশে একটি আলমারি, তারপর খুব একটা বেশী ফাঁকা জায়গা ছিল না। কোণায় একটি টেবিলের উপরে রাখা গোটা তিনেক ফোন যার ভিতরে লাল ফোন যেটা দিয়ে সকালে তিনি সবার সাথে যোগাযোগ করেন। সাইড টেবিলে আরও কয়েকটি পাইপ আর তাঁর শখের এরিনমোর পাইপ টোবাকো। লক্ষ্য করলাম সিঁড়ি থেকে এ ঘর পর্যন্ত রক্তে রক্তে ছেয়ে গেছে। প্রায় শুকিয়ে উঠা রক্তের গন্ধ পেটে যেতেই কেমন অসহ্য লাগল। অনেক বুটের দাগ। মনে হল সৈনিকদের চলাচলে এগুলো হয়েছে। মাস্টার বেড রুমের মধ্যেই পরিবারের নিহত সব মৃতদেহগুলোই দেখলাম। হয়ত একই রুমে সকলকে হত্যা করা হয়েছে অথবা দু' একজনের মৃতদেহকে একত্র করার জন্যে এক রুমেই নিয়ে আসা হয়েছে।

বেড রুমে ঢোকার মুখেই বেগম মুজিবের মৃত দেহখানি দেখলাম। একটু পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কামাল, জামাল আর তাদের সদ্য বিবাহিত বধুদ্বয় এবং সবার শেষে কোণার দিকে অবুঝ শিশু রাসেলের মৃত দেহ। রাসেল বঙ্গবন্ধুর ছোট সন্তান বলেই তাকে আদরও করতেন অনেক বেশী। রাসেলের মৃতদেহ দেখেই আমার ভীষণ প্রতিক্রিয়া হল। মনটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠল। এ অবুঝ শিশুর প্রাণ হরণ করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে। পরে আমাকে আমার পাশে দাঁড়ানো অফিসারই জানালো যাতে কোন চাক্ষুষ প্রমাণ না পাওয়া যায় সে জন্যই সবাইকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এ কথার কতখানি যৌক্তিকতা আছে তা ভেবেই দেখিনি সেদিন।

---

১. আগের উল্লেখিত বই *Bangladesh : A Legacy of Blood* এর ৭৩-৭৪ পৃঃ দ্রঃ ।

জামালের চেহারার দিকে আবার তাকালাম। তাকে খুব কাছে থেকে গুলী করা হয়েছে। তার রক্ত আর শরীরে মাংস ঝলসে দেয়ালে ছিটকে লেগেছিল। জামালকে দেখে মনে পড়ে মাত্র কয়েকদিন আগেই তার বিবাহ উত্তর পার্টি হয়েছিল ৪৬ ব্রিগেড অফিসার মেসে। নব বিবাহিত দম্পতিকে সেনাবাহিনীর মেসের প্রথা অনুযায়ী অন্যান্য অফিসার ও পরিবারের সাথে পরিচয় করানোর জন্য। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল Sandhurst মিলিটারি একাডেমি থেকে কমিশন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২য় ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নে নিয়োগ করা হয়। ২য় বেঙ্গল তখন ঢাকায় অবস্থিত। Sandhurst পৃথিবীর অন্যতম সেরা মিলিটারি একাডেমি। UK এর মিলিটারি একাডেমি বলে এটা Royal Military একাডেমি হিসেবেই পরিচিত। Sandhurst এ একজন ক্যাডেটকে পাঠাতে হলে অত্যন্ত কঠিন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। জামাল যদিও এসবের মধ্যে দিয়ে যায়নি তবুও তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন দেয়া হয়। তার এভাবে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে প্রচুর সমালোচনাও হয়। তাকে আমি প্রথম দেখি যখন প্রথম ইনটারভিউর জন্য কমান্ডারের নিকট আনা হয়। তার সাথে আমি প্রায় এক ঘন্টা কথা বলি বিশেষ করে জানতে চাই তার Sandhurst এর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। আমার মনে আছে আমি আর সাফায়াত জামিল প্রথমে জামালকে সেনানিবাসের প্রথা অনুযায়ী অফিসার মেসে এবং বিবাহ পরবর্তীতে সেনা ছাউনিতে থাকার ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম। সে রকম নির্দেশ তার ইউনিট কমান্ডারকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন পর কর্নেল সাফায়াত জামিল আমাকে তার অফিসে ডেকে স্বভাবসিদ্ধ স্মিত হাসি দিয়ে জানালেন, বঙ্গবন্ধু জামালকে তার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী নিজের কাছেই রাখতে চান এবং সেখান থেকেই সে নিয়মিত ইউনিটে যাতায়াত করবে। আমি কমান্ডারকে একজন নবীন অফিসারের সেনাছাউনির বাইরে থাকার ব্যাপারে অন্যান্য অসুবিধার কথা স্মরণ করালে তিনি হেসে জানালেন, Out living sanction করা হয়ে গেছে। পরে যতদিন জামাল জীবিত ছিল একটা সাদা মার্সিডিজ গাড়ী চালিয়ে ইউনিটে যাতায়াত করত। জামালের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলাম নিয়তিই হয়ত তাকে সেনানিবাসে থাকতে দেয়নি, থাকলে ভাগ্যে কি থাকত তা বলাও কঠিন।

ঘন্টা কয়েক বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে থেকে এ হৃদয়বিদারক ঘটনার স্থল থেকে আনুমানিক ১০টা ৩০ মিঃ দিকে চলে এলাম ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে। ফেরার পথে সমস্ত পথটা ভাবতে ভাবতে আসলাম। বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেক রক্তাক্ত অধ্যায়ে যোগ হল এমন এক ব্যক্তির আর তাঁর পরিবারের রক্ত যার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তবে এ রক্তাক্ত অধ্যায় কি এখানেই শেষ ? তখনও বুঝতে পারিনি এ রক্তাক্ত অধ্যায়ের শেষ কোথায় হবে।

তিন

আমি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে ফিরে এসে জীপ থেকে নেমেই কমান্ডারের রুমে যাই। কর্নেল সাফায়াত জামিল তখন অন্য কারও সাথে টেলিফোনে আলাপ করছিলেন। আমাকে বসতে বলে সব শুনলেন। মনে হল তার চেহারায় একটা কঠিন ছাপ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, "These people are murderer and lunatics anything is possible for them. The are not human being anymore." তিনি আমার হাতে থেকে Film গুলো নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচারা করে আমার হাতে ফেরৎ দিয়ে এগুলো সেনাসদরে পাঠাতে বললেন। পরে সেগুলো আমি সেনাসদরে পাঠিয়ে দেই।

সকাল থেকেই ব্রিগেডের ঢাকাস্থ তিনটি পদাতিক ইউনিট আর জয়দেবপুরস্থ অন্যটিকেও standto বা সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না পেয়ে শুধু Defensive Position নিতে বলা হয়। কিন্তু এরপর থেকে আর কোন Order পাওয়াও যায়নি এবং আমার জানামতে উর্দ্ধতন কর্তপক্ষ থেকেও পাওয়া যায়নি। ব্রিগেডের বাকী ইউনিট ও পদাতিক ব্যাটালিয়নগুলোতে তেমন কোন ঝামেলা সেদিন লক্ষ্য করা যায়নি শুধুমাত্র ১ম বেঙ্গল যেখানে সকালে সকলেই জমায়েত হয়েছিল। কেন ঐ ইউনিট বেছে নিয়েছিল তা অবশ্য আমার আজও জানা হয়নি। বোধ হয় ইউনিটের সাপোর্টের জন্য মেজর হাফিজ উদ্দিনকেও সাথে নিয়ে যায় যেহেতু সে ঐ ব্যাটালিয়নেই কমিশন প্রাপ্ত হয়।

অল্প কিছুক্ষণ পরে সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ আসলেন কমান্ডারের অফিসে। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আর কিছু Instruction দিলেন কিন্তু ব্রিগেডের কিছু করণীয় আছে কিনা এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বললেন না।একটু পরেই মেজর ফারুক রহমান (পরে কর্নেল ও অবঃ) উপস্থিত হল। তার পরণে ট্যাংক এর কালো পোশাক। সিজিএসকে সে তার ট্যাংক কোন Amnunition

নেই, রাজেন্দ্রপুর থেকে আনতে হবে এবং সে জন্য সিজিএস এর অনুমতি লাগবে বলে জানাল। এই প্রথম আমি জানলাম যে, ফারুকের কোন ট্যাংকেরই মেইন গানের কোন গোলাবারুদ রাতের অভিযানের সময় এবং প্রায় সকাল ১০ পর্যন্ত ছিলনা। ফারুক বলতে লাগল তারা কত বড় ঝুঁকি নিয়ে গোলাবারুদ ছাড়াই এ অভিযানে বের হয়েছিল এমনকি তাদের ট্যাংকের মেশিনগানগুলোরও গোলাবারুদ না থাকাতে ১৫ তারিখ ভোরে COD এর গেট ভেঙ্গে কিছু গোলা বারুদ নিয়ে আসে তাও শুধু মেশিনগানের। ফারুক আরও জানালো গোলাবারুদ না থাকা সত্ত্বেও তারা খালি ট্যাংক নিয়ে সকলকে, এমনকি রক্ষী বাহিনীকেও ফাঁকি দিতে পেরেছে। কারণ ১৫ই আগস্টে যখন বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে হামলা করা হয় তখন ফারুক দুটো ট্যাংক নিয়ে শেরে বাংলানগরে রক্ষী বাহিনী হেডকোয়ার্টার ঘিরে ফেলে এবং সেখানে উপস্থিত ব্যাটালিয়নকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। সিজিএস সব শুনে তক্ষণি রাজেন্দ্রপুরে ট্যাংকের গোলাবারুদ দেয়ার কথা বলে দিলেন। প্রসঙ্গত গোলাবারুদ সেনাসদরের জিএস (জেনারেল স্টাফ) ব্রাঞ্চ যার প্রধান হলেন সিজিএস (চীফ অব জেনারেল স্টাফ) এর আওতায় থাকে। মনে পড়ে এ ট্যাংকগুলো (প্রায় ৩০টা) মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৩ সনে আরব ইসরায়েল যুদ্ধে বাংলাদেশ আরবদের সাপোর্ট করেছিল বলে বঙ্গবন্ধুকে সৌজন্য উপহার দিয়েছিলেন। ট্যাংকগুলো পৌছানোর অনেক পরে তার সাথে মাত্র ১০০ রাউন্ড গুলী পাঠানো হয়েছিল। আর এই সেই ট্যাংক যার বলে বলিয়ান হয়ে এ অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। ফারুক অল্প কিছুক্ষণই ছিল। এক ফাঁকে সিজিএস জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তারা এ অভ্যুত্থানের আগে কি ভেবেছিল যে ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে? তার উত্তরে ফারুক বলেছিল এ বিষয়ে তারা অনেক ভেবেই পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে। ফারুক যেমনই ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমনই ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। ফারুকের চলে যাওয়ার পর সিজিএস হেসে সাফায়াত জামিলকে বলল যে, কিভাবে তিনি তাদের (অভ্যুত্থানে লিপ্ত অফিসারদের) পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে যোগাযোগের খবরটা জেনে নিলেন। আমি মনে মনে ফারুকের সাহস আর সিজিএস এর চতুরতার প্রশংসা না করে পারলাম না।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিন বাহিনী প্রধানদের নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা শুনলাম। তার অল্প কিছুক্ষণ পরই স্বয়ং উপস্থিত হলেন

সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ, সাথে উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আর তাদের পেছনে ডিজিএফ আই (ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স) ব্রিগেডিয়ার (প্রয়াত) আব্দুর রউফ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ আগেই উপস্থিত ছিলেন। কর্নেল সাফায়াত জামিল সামরিক প্রথামত উঠে দাঁড়ালে সেনাপ্রধান এগিয়ে গিয়ে ব্রিগেড কমান্ডারের চেয়ারে বসে পড়লেন। সেনা রীতিতে কখনই কোন উর্ধ্বতন অফিসার অধীনস্ত অফিসারের চেয়ারে বসেন না। আমি এই প্রথম আমার সল্প চাকুরিতে সেনাবাহিনীতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অধীনস্ত কর্মকর্তার চেয়ারে বসতে দেখলাম। আমার কাছে মনে হল সাফায়াত জামিল সে মুহূর্তে আর ব্রিগেড কমান্ডার রইলেন না বরং সেনাপ্রধানই কার্যত ব্রিগেড কমান্ডার হয়ে গেলেন। কর্নেল সাফায়াত জামিল অসহায়ের মত এককোণায় বসে রইলেন। উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানসেনা প্রধানের সামনে সমস্ত সময়টা নিরব দর্শক ও স্রোতার ভূমিকা পালন করে গেলেন। খালেদ মোশারফ তার স্বভাবজাত শান্ত মূর্তিতে সেনা প্রধানের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতে থাকলেন। সেনা প্রধানের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রউফ বিভিন্ন জায়গায় ফোন সংযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন অনবরত। কিন্তু কেউই ব্রিগেড কমান্ডারকে পরবর্তী কার্যক্রমের কোন নির্দেশ দিলেন না। ব্রিগেডিয়ার রউফ বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলের সাথে যোগাযোগ করে ফোনটি সেনাপ্রধানের হাতে দিলে তিনি খলিলকে জিজ্ঞেস করলেন রেডিওতে তার আনুগত্য প্রকাশের বক্তব্য শুনেছেন কিনা এবং সে সাথে তিনি খলিলকে রেডিওতে গিয়ে একইভাবে সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বলে বল-লেন, আমরা সবাই এর মধ্যে আছি। হঠাৎ সিজিএস বললেন রক্ষীবাহিনীর কোন উর্ধ্বতন অফিসারকে এনে একইভাবে রেডিওতে পাঠাতে। কেউ একজন জানালেন নুরুজ্জামান দেশে নেই, লেঃ কর্নেল সবিউদ্দিন আগের দিন বগুড়ায় চলে গেছেন কোন কাজে। কাজেই মেজর হাসানকে খোঁজ করে আনা যেতে পারে। হাসান একজন অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসার যিনি প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন। পরে তাকেও খুঁজে না পেয়ে মেজর শরিফ (পরে ব্রিগেডিয়ার ও অবসর প্রাপ্ত) রক্ষী বাহিনীর ট্রান্সপোর্ট অফিসার তাকে এনে হাজির করা হল। সিজিএস তাকেই রেডিওতে গিয়ে রক্ষীবাহিনীর হয়ে আনুগত্য প্রকাশের কথা বলায় সে হাসানের কথা বলতে গেলে সিজিএস ধমকের সুরে তাকে Order Comply

করতে বললেন। এদিকে রউফ বঙ্গবন্ধুর এমএস (মিলিটারি সেক্রেটারি) ব্রিগেডিয়ার (প্রয়াত) মশহুরুল হককে খুঁজছিলেন। তার কথা শুনে খালেদ ব্যঙ্গ করে যা বললেন তার অর্থ হল ডিজিএফআই চীফ হয়েও উনি জানেন না মশহুরুল হক এখন কোথায়? মশহুরুল হক অভ্যুত্থানকারী সৈনিকদের হাতে বন্দী হয়ে গণভবনের কোথাও আছেন সে কথা সিজএসই জানালেন। খালেদের বিবরণে জানা গেল প্রতিদিনের অভ্যাস মত মশহুরুল হক প্রাত ভ্রমণে বের হলে অভ্যুত্থানকারী সৈনিকদের সামনে পড়েন এবং তার পরিচয় জানার পর তাকে সে অবস্থাতেই গ্রেফতার করা হয়। পরে অবশ্য তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রায় ১২টার দিকে সেনাপ্রধান উপ-প্রধানকে নিয়ে সেনাসদরের দিকে চলে যান। খালেদ আরও কিছু সময় পরে সাফায়াত জামিলকে নিয়ে বাইরে কোথাও রওনা হয়ে যান। যাওয়ার সময় আমাকে Tank এর Ammunition পাওয়া গেল কিনা সে সম্বন্ধে খোঁজ নেবার কথা বলে গেলেন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, বীর উত্তম পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে আমরা ক্যাডেট থাকা অবস্থায় Weapon Training Officer ছিলেন। অত্যন্ত চৌকস, সুদর্সন বাঙালী তরুণ ক্যাপ্টেন যাকে নিয়ে আমরা বাঙালী ক্যাডেটরা বেশ গর্ববোধ করতাম। তিনি বাঙালী ক্যাডেটদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তখন থেকে তাকে বেশ জেদী, সাহসী আর বুদ্ধিমান হিসেবেই দেখেছি। বাংলাদেশে তখনকার সিনিয়র অফিসারদের মধ্যেও তিনি চৌকস অফিসার হিসেবে খ্যাত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং তার সেক্টরে ৪,৯ আর ১০ই বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে তার নামের আদি অক্ষরের সাথে মিলিয়ে নাম করণ করা হয় 'কে' ফোর্স। 'কে' ফোর্স এর অপারেশন এরিয়া ছিল ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও নোয়াখালি। খালেদ মোশারফের সেক্টরে প্রায় ৬ হাজার নিয়মিত আর প্রায় ৩৫ হাজার গেরিলা সদস্য ছিল।

কসবা অপারেশান দায়িত্বে তিনি তার সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন (বর্তমানে মেজর জেনারেল)কে দেন যার তদারক নিজেই করছিলেন। কসবা এলাকায় পাকিস্তানি সেনার এক কোম্পানি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা রচনা করেছিল। আইনউদ্দিনকে দায়িত্ব দিয়েও আক্রমণের সময়ে নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। যুদ্ধ চলার সময়েই একটি শত্রু শেলের

স্প্রিন্টার খালেদ মোশারফের মাথায় লেগে তার মাথার খুলি প্রায় আলাদা করে ফেলে। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় কসবা দখল করার পর আগরতলার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তিনি জীবনে বেঁচে যান কিন্তু তার মাথায় কপালের সামনে বিরাট ক্ষত চিহ্ন চির-জীবনের জন্যে থেকে যায়।[১]

সাফায়াত জামিলের বাহির থেকে ফেরার কিছু পূর্বে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতর থেকে ডিউটি অফিসার আমাকে টেলিফোনে জানালো যে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ট সহচর এবং তাঁর রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমেদ রক্ষীবাহিনী সদর দফতরে সকাল থেকে আছেন এবং তাকে কোথায় পাঠাতে হবে তার কোন নির্দেশ আমাদের তরফ থেকে পাওয়া যাবে কিনা? কথাটা ছিল অনেকটা 'তাকে নিয়ে আমরা কি করব' এ ধরনের। আমি সত্যিই আশ্চার্য হলাম। রক্ষীবাহিনী এমনভাবে আত্মসমর্পণ করল যে, তারা জনাব তোফায়েল আহমেদকে কিছু সময়ের জন্যে রাখতেও বিব্রত বোধ করছে। অথচ এই তোফায়েল আহমেদই ছিলেন রক্ষীবাহিনীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা বস্তুত তিনিই রাজনৈতিক ভাবে রক্ষীবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন। কারণ রক্ষীবাহিনী প্রথমে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর পরে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হলে সরাসরি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ভাবতেই অবাক লাগল যে রক্ষীবাহিনী নিয়ে প্রথমে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারি এবং পরে সমগ্র সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা করে উৎকণ্ঠিত ছিল সেই বাহিনী তাদের সদর দফতরে তোফায়েল আহমেদকে রাখতে সাহস পাচ্ছে না। উল্লেখ্য, ১৫ই আগস্ট এবং তার পরেই অনেকদিন সেনাবাহিনীতে কোন Chain of command ছিল বলে মনে হয়নি। Dhaka তে অবস্থান রত সেনা ফরমেশন এবং অন্যান্য ইউনিটগুলোর মধ্যে একমাত্র ৪৬ ব্রিগেডের ইউনিটের Chain of Command ছাড়া আর সবই হয়ে পড়েছিল Disorganised. In-fact entire Chain of Command in Dhaka Collapsed. বাইরের Formation গুলো ঢাকা থেকে দূরে থাকায় এর প্রভাব অতখানি না পড়লেও ১৫ই আগস্টের ডালিমের রেডিও ঘোষণার পর কুমিল্লায় ৪৪ বিগ্রেড অধীনস্ত ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর অনেক সৈনিক ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়ে যা পরে সাফায়াত জামিলের হস্তক্ষেপে থামানো হয়। এ কারণেই সেদিন থেকে

---

১. মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম রচিত 'রণাঙ্গনে' 'জেড ফোর্স,' কে ফোর্স, এস ফোর্স'।

বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেনাসদর বাদ দিয়ে ভেতরে বাইরে সকলেই ৪৬ ব্রিগেড সদর দফতরে পরবর্তী আদেশ নির্দেশের জন্যে ফোন করতে থাকেন। তেমনি রক্ষীবাহিনী সদর থেকেও তোফায়েল আহমেদ সংক্রান্ত ফোনটি পাই। কমান্ডার সেনাসদর থেকে ফেরার পরপরই আমি তোফায়েল সম্বন্ধে জানালে তিনি শুদ্ধ ভাষায় বললেন যে, আমাদের কিছু করণীয় নেই। আরও বললেন যে, আমি যাতে রক্ষীবাহিনীকে জানাই যে, তোফায়েল আহমদকে পুলিশের নিরাপত্তামূলক হেফাজতে তার বাড়ীতে রাখার জন্যে। আমি অনুরূপ ভাবে রক্ষীবাহিনী সদরে জানিয়ে দেই।

তোফায়েল আহমেদের সাথে ইতিপূর্বে আমার মুখচেনা পরিচয় ছিল তবে সাফায়াত জামিলের কাছে পূর্বেই তাদের পূর্বপরিচয়ের কথা শুনেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সাফায়েত জামিলের সাথে তোফায়াল আহমেদের যথেষ্ট হৃদয়তা গড়ে উঠে। আমার মনে পড়ে ১৬ বা ১৭ই আগস্ট সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ কমান্ডার অফিস থেকে বের হয়ে আমাকে ডেকে তার সাথে জীপে বাইরে যেতে বললেন। এটা অনেকটা সাফায়াত জামিলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমরা প্রায়ই সন্ধ্যায় অফিস করতাম আর প্রায়ই অফিসের পরে তারই জীপে উদ্দেশ্য বিহীনভাবে শহরে ঘুরতাম। ঠিক সেদিনও কোনকিছু জিজ্ঞেস না করে তার সাথেই রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমরা কোথায় যাচ্ছি একথা যেমন আমিও জিজ্ঞেস করিনি তেমনি তিনিও বললেন না, তবে সেনানিবাস থেকে বের হয়ে ফার্মগেট পার হতেই তিনি ড্রাইভারকে যে রাস্তার নির্দেশ দিলেন তাতে একটু আশ্চর্য হলাম; বুঝতে পারলাম যে, আমরা তোফায়েল আহমেদের বাসার দিকে যাচ্ছি। বেশ কিছুটা কৌতূহলও হল তোফায়েলের কাছ থেকে এ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে তার ধ্যান ধারণা বা প্রতিক্রিয়া জানতে পারব।

তোফায়েল আহমেদ তখন ধানমন্ডিতে থাকতেন। তার বাসার সামনে গাড়ী রেখে আমরা পুলিশ প্রহরা অতিক্রম করে তার বসার ঘরেই দেখতে পেলাম তিনি রাতের আহার করছেন। হঠাৎ করে আমাদের আগমন দেখে কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। সাফায়াত জামিলকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হল একজন বিধ্বস্ত মানুষ কিছুটা সাহস পেলেন। কুশলাদী বিনিময়ের পর তিনি জানালেন একদিন পর পূর্ণাঙ্গ আহার করতে বসেছেন। এর মধ্যে সাফায়াত জামিল আমাকে পরিচয় করায়ে দেয়ায় তিনি আমাকে চিনতে পেরে জানালেন,

আজকের খাবারটাও আমার এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে পাঠানো হয়েছে। সাফায়াত জামিল তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সাহস সঞ্চয় করতে বলে তার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবেনা বলে আশ্বাস দিলেন। মনে হল আতঙ্কগ্রস্ত মানুষটি এবং তার পরিবার কমান্ডারের কথার পর কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। পরে তোফায়েল আহমদের মুখে শুনলাম যে, তিনি ১৫ তারিখ ভোরে বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়ে ৩২ নং সড়কের দিকে রওয়ানা হয়ে মাঝ পথে সাহস সঞ্চয় করতে না পারাতে এদিক ওদিকে ঘুরে রক্ষীবাহিনী সদরে পৌঁছেন। আশ্চার্য হলাম এই তোফায়েল আহমেদই '৬০ এর দশকে প্রাণবাজী রাখা ছাত্র নেতা ও বঙ্গবন্ধুর নিকটতমদের মধ্যে একজন ছিলেন। আইয়ুব আমলের প্রতিবাদী ছাত্রনেতা আজ এবং তারপরও এ ঘটনার কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না হয়তা বা তখনকার পরিস্থির কারণে। আমরা কিছুক্ষণ সেখানে থেকে চলে আসি। পরে জানতে পারি ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডারের এ সৌজন্য সাক্ষাতকারটি তখনকার কর্তৃপক্ষ ভালভাবে নেয়নি।

১৫ই আগস্ট প্রায় বেলা দু'টোর দিকে সাফায়াত জামিল আমাকে অফিসে রেখে তার বাসায় খেতে চলে গেলেন। এর মধ্যে আরও অনেক অফিসার ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে এসেছিল। সাফায়াত জামিলের অফিস থেকে যাওয়ার পর আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ী থেকে আবার টেলিফোন পাই। অপরপ্রান্ত থেকে হুদা জানালো ওখানে রক্ষিত মৃতদেহগুলো সৎকারের জন্যে স্টেশন কমান্ডারকে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে। আমি সাথে সাথে সংবাদটি স্টেশন কমান্ডার লেঃ কর্নেল হামিদকে জানিয়ে দিলাম।

বিকেল ৫টার দিকে কমান্ডার আবার অফিসে আসলেন এবং সেদিনের সমস্ত ঘটনা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। সন্ধ্যার দিকে সিজিএস আসলেন আবার। কমান্ডারের আসার আগে একবার সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ কমান্ডারের খোঁজে ফোন করেছিলেন। তার গলার আওয়াজে আমার মনে হল তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করছেন। তাকে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত মনে হল। মনে হল তিনি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সিজিএস আর কমান্ডার কিছুক্ষণ পর ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দিকে গেলেন। কমান্ডার ১ম বেঙ্গলের দিকে রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিএম মেজর হাফিজ প্রায় সারা দিন অনুপস্থিত থেকে হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে

পারলাম যে, প্রায় সারাদিনই তিনি বঙ্গভবনে কাটিয়েছেন। কেন ছিলেন সে বিষয়টি আজও সুস্পষ্ট নয়।

রাত প্রায় ৯টার দিকে কমান্ডার ফিরলেন। হেড কোয়ার্টারের কিছু জরুরী নির্দেশ দিলেন। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের ডিফেন্স রাতের জন্যে আরও কার্যকরি করারও নির্দেশ দিয়ে তিনি এবার বিএম হাফিজ কে নিয়ে রাতে ১ম বেঙ্গলে থাকার জন্যে চলে গেলেন। সে রাতে ১৫/১৬ আগস্ট আমি আর গফফার হালদার দু'জনে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে থেকে গেলাম। মনে আছে আমরা দু'জনেই দু'টো চাইনিজ এসএমজিতে ম্যাগজিন ভর্তি করে মাথার কাছে রেখে ঘুমালাম। সে রাত আমরা এক দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছি। রক্ষীবাহিনী পাল্টা আক্রমণের আশাংকা করছিলাম যদিও সকালেই তারা আত্মসর্ম্পণ করেছে। ফারুকের ট্যাংক তখনও রক্ষীহেডকোয়ার্টার ঘিরে রেখেছে সেই সাথে সাভার-ঢাকা রোডেও রোড ব্লক করে রাখা হয়েছিল। সেই রাত মানে ১৫/১৬ আগস্ট ঢাকায় অবস্থানরত সমস্ত ইউনিটগুলোই রক্ষীবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কায় সমস্ত রাত কাটায়। কিন্তু তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য না ঘটায় ঐ রাত কোন প্রতিবাদ ছাড়াই কেটে গেল। আশ্চার্যজনক যে, এতবড় ঘটনার কোন প্রতিবাদ কোথাও থেকে উঠেনি এমনকি ১৫ তারিখ সকাল থেকেই এমপি হোস্টেল এবং অন্যান্য জায়গা হতে সংসদসদস্যগণ, যার বেশীর ভাগ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সদস্য, তাদের পরবর্তী করণীয় বা তারা আমাদের (মানে সেনাবাহিনীর) কোন কাজে আসতে পারে কিনা এসব জানার জন্যে ব্রিগেড এবং অন্যান্য হেড কোয়ার্টারে অনবরত ফোন করেই যাচ্ছিল। Army তে কোন Chain of command না থাকায় কোন সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনাও পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনকি সেদিন এবং তার পরেও অনেকদিন কোন সরকারও ছিলনা যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বাংলাদেশ বেতার রেডিও বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়ে মাঝে মধ্যে এমনি বুলেটিন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা শুরু করল যার কোন অনুমোদন সরকারের তো নয়ই, সশস্ত্র বাহিনীরও কোন সংশ্রব ছিলনা। ১৫ই আগস্টের পর থেকে রেডিও স্টেশন কন্ট্রোলের দায়িত্ব ছিল মেজর শাহরিয়ারের। এসব দায়িত্বহীন বিজ্ঞপ্তি নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল রেডিও বুলেটিনের বদৌলতে। হঠাৎ রেডিও থেকে প্রচার করা হল সেনাবাহিনীর সমস্ত অবসর প্রাপ্ত অফিসারগণকে স্টেশন

হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করার জন্য। এক ঘন্টার মধ্যেই অনেক অবসর প্রাপ্ত অফিসার এবং কয়েকজনকে জেল থেকেও বের করে এনে স্টেশন হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত করা হলে সেখানকার অধিনায়ক লেঃ কর্নেল হামিদ তাদেরকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে বললে তারা ব্রিগেড সদরে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রিগেডেরও এ বিষয়ে কিছু করণীয় ছিলনা কারণ এ মর্মে কোন সরকারি নির্দেশ বা সেনাসদর থেকেও কোন নির্দেশ ছিল না। এ সব ব্যাপারে সেনাসদরের সাথে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এমনি অনেক কিছুই দু' একদিনের ব্যবধানে ঘটে যার কোন আইনগত সরকারি অনুমোদন দেয়া হয় নি। আমার কাছে এ সমস্ত অসংলগ্ন কার্যকলাপের বালখিল্যতা মনে হচ্ছিল। যেমন রেডিও থেকে অনবরত পাকিস্তানি উর্দুগান প্রচারের কারণটি আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি। এসব হয়েছিল কোন পর্যায়েই কোন কর্তৃত্ব না থাকর কারণে। দেশে সরকার নেই, সেনাবাহিনীতে Chain of Command বিধ্বস্ত। এমন অবস্থায় পরিস্থিতি একটা চরম বিশৃঙ্খলতার মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক। মনে হচ্ছিল সমগ্র দেশ কয়েকজন মেজরের হাতে জিম্মি আর সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা বেমালুম সহাস্যে সহ্য করে যাচ্ছিলেন চরম স্বেচ্ছাচারিতা যার প্রতিবাদও করার সাহস কেউ করেননি। আমার মনে হল সকলেই স্রোতের সাথে গা এলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। আবার অনেকে অভ্যুত্থানের নায়কদের চোখে পড়ার জন্য স্বউদ্যোগেই অনেককিছু করার চেষ্টা করেন। অনেকে একাত্মতাও প্রকাশ করেন। মনে হচ্ছিল যেন একটা Free for all পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে। ৪৬ ব্রিগেডের একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ছিল জয়দেরপুরে যার তৎকালীন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল হারুন আহমেদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা অফিসার হিসেবে বদলি হওয়াতে সেখানে অধিনায়ক ছিলনা। কমান্ডার একজন অধিনায়কের বিশেষ প্রয়োজনের ব্যাপারটি সিজিএস কে জানালে তিনি তৎকালীন এমএস কে সত্তর একজন অধিনায়ক পোস্ট করার জন্য বলেন। সে অনুযায়ী ১৫ আগস্ট লেঃ কর্নেল আমীন আহমেদ চৌধুরীকে (বর্তমানে মেজর জেনারেল) নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাকে সরাসরি জয়দেবপুরে যেতে বলা হলে তিনি সাভার হয়ে জয়দেবপুরে যান এবং পথে সাভারে রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে থেমে সমস্ত সদস্যদের একত্র করে তাদের উদ্দেশ্যে

শান্ত এবং বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নেয়ার জন্য উপদেশ দেন। পরে মেজর রেড্ডি রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষক উপদেষ্টাকে ভারতীয় দূতাবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এসব পরের দিন তার মুখ থেকেই শোনা। আমীন আহমেদ চৌধুরী বোধ করি দু-তিন দিন জয়দেবপুরে থেকে সরাসরি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের এমএস হিসেবে সেখানে কয়েকদিন থাকেন পরে খালেদ মোশারফ তাকে বঙ্গভবন ছেড়ে তার ইউনিটে চলে যেতে বলেন। পরে অবশ্য তার অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ বাতিল করে সেনাসদরে বদলি করা হয়। সেনাসদর এ ধরনের বদলি পুনঃ বদলি সম্বন্ধে কতখানি ওয়াকেবহাল ছিলো জানিনা। তবে আমার কাছে মনে হল সম্পূর্ণ Systemই অব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল ১৫ই আগস্টের পর।

১৭ই আগস্ট সাফায়াত জামিল সেনাসদের থেকে ফিরে এসে জানালেন সেখানে এক কনফারেন্সে ঢাকায় কর্মরত সব উর্ধ্বতন কমান্ডারই ছিলেন যেটা সেনাপ্রধানের সভাপতিত্বে হওয়ার কথা থাকলেও কার্যত রশীদ আর ফারুকই সবাইকে এ অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা আর এ পর্যন্ত ঘটে পাওয়া ঘটনার সর্বশেষ বিবৃতি দেয়ার চেষ্টা করে। সাফায়াত জামিলের সে বর্ণনা মতে কেউই সেদিন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার মত ছিল না। তিনি নিজে বিরক্ত হয়ে তাদেরকে থামতে বলেন আর মোশতাককে Userper হিসেবে আখ্যায়িত করে কনফারেন্স ছেড়ে চলে আসেন। তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে আসেন কারণ এই যে মেজরদের সামনে কোন সিনিয়র অফিসারই মুখ খুলতে সাহস পান নি। যাই হোক সাফায়াত জামিলের দৃঢ়তার জন্য সেদিন ঐ ব্রিফিং সেশন মেজর ফারুক আর রশীদ শেষ করতে পারেনি।

মনে পড়ে ১৮ তারিখ সকালের দিকে মেজর শরিফুল হক ডালিম ব্রিগেডে উপস্থিত হয় একটি খোলা জীপে চড়ে যার উপরের কেনোপি খোলা অবস্থায় একটি মেশিন গান লাগানো ছিল। ডালিমের সাথের সৈনিকরা সকলেই সশস্ত্র আর তার নিজের কোমরের বেল্টে একটি পিস্তল। হেড কোয়ার্টারে আমি তখন একা। কমান্ডার সেনাসদরে কোন কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। ডালিম এসেছিল সাফায়াত জামিলের খোঁজে কিন্তু তাকে না পেয়ে চলে যাওয়ার সময় আমাকে সামনে পেয়ে তার সাথে সিএমএইচ এ (কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল) যেতে

অনুরোধ করল। ডালিমের সাথে অভ্যুত্থানের পর এই প্রথম দেখা। অগত্যা অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সাথে জীপে বসে পড়লাম। যেতে যেতে সে জানালো শেখ সাহেবের বাড়ীতে হামলার সময় শেখ কামালের গুলীতে ১ম ফিল্ড আর্টিলারীর একজন সৈনিক মারা যায়, অন্যত্র ক'জন গুরুতর আহত হয়ে সিএম-এইচ এ ভর্তি আছে, সে তাদেরকেই দেখতে যাচ্ছে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি এই সৈনিকরাই রাষ্ট্রপতির বাড়ীর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল এবং প্রত্যাবর্তনের পর কয়েকমাস আমি এই ইউনিটে কর্তব্যরত ছিলাম। ১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী মুক্তিযুদ্ধের সময় জন্ম হয় যখন প্রথম ব্যাটারির (৬টি গান নিয়ে সংগঠিত) নাম করণ করা হয় ১ম মুজিব ব্যাটারি। পরে পূর্ণাঙ্গ রেজিমেন্টে সংগঠিত হয়। সিএমএইচ এ যেতে যেতে ডালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম এ রকম একটা ঝুঁকি তারা কি নিজেরাই নিয়ে ছিল এ অভ্যুত্থান যে বিচ্ছিন্ন গুটি কয়েক জুনিয়র অফিসার আর মাত্র দু'টো ইউনিট নিয়ে সংগঠিত হয় তাতে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার আংশকা ছিল অনেক । যদি তাই হত তার পরিণতি কি হত? তারা কি এ ব্যাপারে একবারও ভেবে দেখেছিল ? আরও জানতে চাইলাম গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ীতে কোন এ্যাকশন কেন নেয়া হয় নি? এ প্রশ্ন করার পেছনে আমার মাথায় ডালিমের চাকুরিচ্যুতি ও গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ীতে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার প্রেক্ষাপট কাজ করছিল।

আমার কথার জবাবে ডালিম জীপ চালাতে চালাতে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মুচকি হেসে জানলো, এ অভ্যুত্থান বহুদিনের ফসল এবং তার মতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই করা হয়েছে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। হাসতে হাসতে অত্যন্ত সহজ ভাবে বলল যে, অল্প কয়েকজন এ অভ্যুত্থানে জড়িত এরূপ ধারণা আমি কোথায় পেলাম। সে জানালো কিভাবে সমস্ত সিনিয়র অফিসাদের সমর্থন তারা আদায় করেছিল। সে আরও বলল, 'How do you know this was not planned and discussed with others'.হয়ত এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলেছিল যা আমার এখন সঠিক মনে নেই। তবে তার সেদিনের কথার প্রতিধ্বনি এনথনি মাসকারনিহাস তার বই Bangladesh: A legecy of Blood এর বহু জায়গায় অনেকরকম ভাবে করেছেন। বিশেষ করে ফারুকের সাথে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা পর্যায়ে বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারের সাথে আলোচনা, সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাতকার এবং তাদের মধ্যে এ অভ্যুত্থান নিয়ে

আলোচনা ইত্যাদির কথা বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে আমার সুস্পষ্ট মনে আছে আমার কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল ১৫ই আগস্ট ভোরে সর্বপ্রথমে যখন খবরটি নিজে উপ-প্রধানের বাড়ীতে গিয়ে জানান তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিরুত্তাপ অভিব্যক্তিতে যখন জিয়া সাফায়াতের মুখে রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার খবর শুনে বলেছিলেন , 'So what, if President is killed vice President is there'. এ উক্তিটি কর্নেল সাফায়াত জামিল ভোরের কাগজে ১৯৯৪ এর ১৫ই আগস্ট হতে ধারাবাহিক নিবন্ধে উল্লেখ করেন। আর একথা ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সনেও কোন এক সময় সাফায়াত জামিল আমাদের কয়েকজনের সামনেও বলেছিলেন। তবে ভোরের কাগজে সেদিনের তার নিজের অভিব্যক্তিটি করতে গিয়ে হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি আমাদের আরও বলেছিলেন, কথাটা প্রায় এ রকম 'How could he (Zia) remained so unnerved after hearing such a shocking news without any reaction.' কথাটা সেদিনকার প্রেক্ষাপটে সত্যই কারণ এ রকম একটা অপ্রত্যাশিত খবর শোনা মাত্র স্বভাবত প্রত্যেকের আচম্বিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং পরবর্তী reaction হওয়াও স্বাভাবিক to the Point হওয়াটাও অস্বাভাবিকই মনে হয় বিশেষ করে জিয়াউর রহমানের মত একজন সিনিয়র অফিসারের। কাজেই ডালিমের কথায় অনেকের জড়িত থাকার কথাটায় যৌক্তিকতা থাকতে পারে। এ বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্নই এখন উঠছে। আমি আরও পরের দিকে এ সম্বন্ধেও কিছু বিশ্লেষণ তুলে ধরব বলে এখানে আর এ প্রসঙ্গ বাড়ালাম না।

দ্বিতীয় পশ্নের উত্তরে ডালিম যা বলেছিল তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয়ের আলোকে। তার কাছ থেকে ও রকম একটা সাহসী উত্তর আশা করছিলাম। ডালিম আবার তার সহজাত হাসি আর ভঙ্গিমায় জানালো যদি অভ্যুত্থান ব্যর্থ হত তার ফলাফল দেখার মত সময় তারা পেতনা। এ চিন্তা ভাবনা করেই তারা এ পদক্ষেপ নিয়েছে। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে শুধু তারাই নয় ঢাকায় কর্তব্যরত প্রায় সব সিনিয়র সেনা অফিসারদেরকেই জড়িয়ে বিচারে বা নির্বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখিন হতে হত। কাজেই তাদের (অভ্যুত্থানে জড়িত যারা) ভয়াবহ পরিণতির পর অন্যদের পরিণতির দায়-দায়িত্বের ভার তাদের উপরে বর্তাত না। In fact he indicated what extreme actions governmet could take in case

of an abortive Coup Deta. হয়ত সামরিক বাহিনী বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারত যার গুজব তখন প্রায়ই শোনা যেত।

আমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ডালিমের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। সে বলল যে, গাজী গোলাম মোস্তফার উপরে যে কোন এ্যাকশন সে দিন নিলে সকলেই অন্যভাবে ব্যাখ্যা দিত 'Every one would have thought that I have done some thing on personal vengence'. এটা সবাই ধরে নিত যে প্রতিশোধমূলক কিছু করা হয়েছে যা তারা সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে। এমন কি গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ীর ধারে কাছেও কাউকে যেতে দেয়া হয়নি এবং সেদিন সে মুহূর্তে তাকে নিয়ে বিশেষ কেউ চিন্তাও করেনি। এটাই অধ্যাপক আবু সাইদ এর 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস' বইটির ১২৩ পৃঃ ১.৩ কলামের প্রশ্নের উত্তর- সেখানে অধ্যাপক সাহেব বলেছেন, 'গাজী গোলাম মোস্তফা ১৫ই আগস্টে কেন নিহত হননি'। তবে এ অভ্যুত্থানে ডালিমের অন্তর্ভুক্তিও তার ব্যক্তিগত আক্রোশের রেশ টানলেও অভ্যুত্থানটি যে আরও গভীর ষড়যন্ত্রের ফল তার সঠিক বিশ্লেষণ আজও হয়নি। যা হোক আমার কাছে সেদিন ডালিমের উত্তরগুলো যুক্তিসংগত মনে হয়েছিল আর তার কথা থেকে আরও একটি সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, এ অভ্যুত্থান অনেক দিনের পরিকল্পনার পর করা হয়েছে এবং অনেকেই এর সাথে কোন না কোন পর্যায়ে জড়িয়ে পড়েছিল। এ পরিকল্পনার কথা বঙ্গবন্ধুও কিছুটা টের পেয়েছিল বলে অনেকের লেখায় প্রকাশ পায়। অশোকা রায়না রচিত 'In side Raw the story of india's Secret service'. বইটিতে এক জায়গায় লেখক বলেছিলেন, ১৫ই আগস্টের পূর্বেই RAW (রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং) এর পরিচালক মিস্টার কাও বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এখানে লেখক বলেন যে, ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসেই RAW বাংলাদেশের পরিস্থিতি খারাপ দেখে এবং একটি অভ্যুত্থানের আশংকা করায় RAW এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিস্টার নায়ের, কাদের সিদ্দিকীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি জানান কিন্তু বঙ্গবন্ধু এসব তথ্যের কোন গুরুত্ব দেন নি। তার প্রায় চার মাস পরে ঢাকাস্থ RAW এর এজেন্ট মেজর রশিদ, ফারুক, লেঃ কর্ণেল ওসমানি, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায় অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তার বৃত্তান্ত জানতে পারে এবং এ সংবাদ

দিল্লীতে পাঠায়। তার কয়েক সপ্তাহ পরে RAW এর প্রধান মিস্টার কাও পান আমদানী কারকদের ছদ্মবেশে এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে সব জানান। কিন্তু এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে বুঝাতে সক্ষম হন নি। নামগুলো তাঁকে দেয়ার পরও তিনি তা দেখে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বলেন, এরা আমার সন্তানের মত এরা আমার কি ক্ষতি করবে। তবে বইটাতে অন্য কোন ব্যক্তিকে জানানো হয়েছিল কিনা তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। এই অংশটুকু আমি সংক্ষেপে বাংলায় পাঠকদের সুবিধার্থে নিম্নে উল্লেখ্য ইংরেজি লেখা হতে তুলেছি। এই বইটির ৬১ পাতায় এ সমন্ধে লেখক যা লিখেছেন তা আমি হুবহু তুলে ধরছি পাঠকগণকে সম্পূর্ণ বিবরণের ধারণা দেয়ার জন্যে "The war liberation was over. Bangladesh was established as a sovereign state with sheikh mujibnur Rahman as head. Raw agents continued to keep an eye on the developments in the newly born country. By the end of 1973, the reports began to indicate unrest in the country. By the end of February 1974, the reports turned to be correct, as two major general strikes were followed by a massive demonstration of hungry marchers. The growing unrest forced Mujib to establish a one party government on February 24, 1974. According to A RAW sovirces the situation in Bangladesh had become critical.

Reports indicated that western intelligence Agencies were becoming very active. Nair, who by now was regarded as respected figure by Mujib Government, met Mujib along with tiger Siddiqi and apprised him of the situation Mujib preoccupied with other events that engulfed his country shrugged off the warning that a coup was imminent.

Four months later, RAW agents recieved, information of a meeting between major Rashid, Major Farooq and Ltcol. Usmani at Zia-ur Rahman's residence. The discussion among other things, had centered on the coup during the three hour meeting one of the participants had doodled on a scrap of paper, which had been carelessly thrown into waste paper basket. The

scrapped paper had been collected from the Rubbish pile by a clerk and passed on to the RAW operative. The information finally reached newDielhi.

Kao, convinced that a coup was in the offing, flew into Dacca, under cover of a pan exporter. After his arrival at Dacca, he was driven to a rendezvous arranged before hand. Mujib is reported to have found the excercise highly dramatic and just could not understand why Kao could not have come to see him officially. But having known him personally, he went along with the charade. The Kao-Mujib Meeting lasted one hour. Kao was unable to convince Mujib that a coup was brewing and that his life was threatened, inspite of being given the names of those suspected to have been involved. the euphoria that" These are my children and they can do no harm" proved to be deat knell.' Reference: " Inside RAW the story of India's secret service' by Asoka Raina. Vikas publication newdelhi, India. যা হোক ডালিমের সাথে কথা বলে আর একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম যে he was not in Killer group. ডালিমকে রেডিওতে ঘোষণার দায়িত্বই দেয়া হয়েছিল এবং রেডিওতে ঘোষণার বদৌলতেই তার নাম এতখানি প্রচার পায়। আমি কথা প্রসঙ্গে আবার একবার জিজ্ঞাসার সুরে বললাম, এ অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবার এবং ঘনিষ্ট দু'জন আত্মীয় আবদুল রব সেরনিয়াবাদ যিনি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভগ্নীপতি আর শেখ ফজলুল হক মনি, সম্পর্কে ভাগ্নে, প্রাণ হারায় আর অন্য কাউকে টার্গেট করা হয়নি এর কোন বিশেষ কারণ রয়েছে কিনা? তার জবাবে সংক্ষেপে সে যা জানালো তার সারমর্ম ছিল এ রকম। ১৫ই আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবর্ধনা কালে বঙ্গবন্ধুকে আজীবন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার কথা ছিল আর ঐ দিনই 'বাকশাল' এর ছত্র ছায়ায় কেবিনেট রিসাফল করে আব্দুর রব সেরনিয়াবাদকে প্রধান মন্ত্রী, শেখ মনিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর শেখ কামালকে যুব লীগের প্রধান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অন্য দিকে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায় এ তিন জনের অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু, সেরনিয়াবাদ এবং শেখ মনির

সাথে ভারতীয় শাসকদের সাথে যে সম্পর্ক ছিল তাতে তাদের তিনজনের যে কোন একজনের অনুরোধেই ভারতের সাথে ২৫ বছরের চুক্তির অধীনে, ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী বাংলাদেশের সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসবে বা আসার কথা। কাজেই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা পর্যায়েই এ তিন জনকে টার্গেট করা হয়। এসব কথার কতখানি ভিত্তি ছিল তা শুধু সেদিনই নয় আজও আমার নিকট রহস্যময় হয়ে রয়েছে। এখন পরিণত বুদ্ধিতেও এ কথার কতখানি সত্যতা আছে তা বিশ্লেষণ করা সহজ নয়। এর জবাব হয়ত আওয়ামী লীগের তৎকালীন সিনিয়র নেতৃবৃন্দ দিতে পারবেন। তবে আমার শুধু একটি বক্তব্য, ডালিমের কথাই যদি ঠিক হয় তবে বঙ্গবন্ধু অনেক সময় পেয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে আক্রমণ হওয়ার পর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই ত এ তথ্য দিতে পারেনি যে, তিনি ভারতের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন। আর বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরও ভারতের তরফ হতে এমন কোন পদক্ষেপের চিন্তা করা হয়নি। আর এটা ঠিক যে, সশস্ত্রবাহিনীর প্রায় বেশীর ভাগ সদস্যই ২৫ বছরের চুক্তিকে সহজ ভাবে নিতে পারেননি এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগকে ভারত ঘেঁষা মনে করত। আর এও বিশ্বাস করত যে, ভারতের কারণেই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে স্বাভাবিকভাবে গড়তে দেয়া হয়নি। এর কারণ অত্যন্ত সহজ। ঐতিহাসিকভাবে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ছাড়াও যুদ্ধের সমগ্র সময় নৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য করে গেছে। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীকারের দাবী যৌক্তিক বলে তুলে ধরেছে। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার জন্যও চাপ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এসবই কি বাঙালীর মায়ায় ? নিশ্চয়ই নয়। এতে ভারতের স্বার্থও জড়িত ছিল। একটি দেশের জাতীয় স্বার্থের বাইরে কখনই নিজের সেনাবাহিনী, অর্থ নিয়োগ ও ব্যয় করা আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার সংজ্ঞায় নেই। ভারত যা করেছিল তা তার নিজের স্বার্থেই করে ছিল আর সেটা ছিল পাকিস্তান ভাগ হলে অবশিষ্টাংশ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ভারতের জন্যে আর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবেনা। অথবা ভারতের বিশ্লেষণে অবশিষ্ট পাকিস্তান আরও অন্তর্ঘাতি যুদ্ধে খন্ড-বিখন্ড হয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের অবসান ঘটিয়ে Lord Mountbatten কর্তৃক পন্ডিত নেহেরুকে দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে রূপান্তিত হবে যাতে তিনি বলেছিলেন পাকিস্তান হবে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র যা ২৫ বছরের বেশী টিকবেনা। (ডোমেনিক ল্যাপিয়ার এবং ল্যারিকলিন্স রচিত 'ফ্রিডম এট মিডনাইট' দ্রষ্টব্য)।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদ নীতি স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান যদি পাকিস্তানের তাবেদার না থাকতে চেয়ে স্বাধীনতার জন্য লক্ষপ্রাণের আত্মহূতি দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হতে পারে, তা কোন ক্রমেই ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবার জন্য নয়। আর এ ধরনের মানসিকতা অন্তত তখনকার বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী সদস্যদের ছিলনা। যারা সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তারাও বিশ্বাস করতেন যে, দেশ একদিন স্বাধীন হবে। আর তা ভারতীয় সশস্ত্র সাহায্য না পেলেও হবে হয়ত আরও কিছু সময় লাগত, আর যারা প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিক ছিল তারাও ভারতীয় মুরুব্বীয়ানা কোন দিন গ্রহণ করতে পারে নি। আর এই একটি বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য এক মত পোষণ করত। আজকের বাংলাদেশ ভারতের সাম্রাজ্যবাদ নীতির বিরুদ্ধে বেশী সোচ্চার ও সজাগ যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালীন সময়েও দেখা যায়নি। আমার মনে পড়ে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান (পাকিস্তানের প্রাক্তন বিমানবাহিনী প্রধান ও তেহরিকে ইসতেকলাল পার্টি প্রধান) তার এক প্রবন্ধে, যা আমি পাকিস্তানে বন্দী শিবিরে থাকাকালীন অবস্থায় পড়ে ছিলাম, তাতে তিনি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান কেন ভারতের সাথে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে ছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তানে' ৯০ হাজার সৈনিকদের ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্ম সমর্পণ করলে তারা জেনেভা কনভেনশনের বিধিমত Pow status পাবে সেটা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া যেতনা। তিনি আরও লিখেছিলেন নভেম্বরের শেষ দিকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, East Pakistan is finished as far as Pakistan is concerned and indepen-dance of Bangladesh is matter of time only. এতেই প্রতীয়মান হয় যে, এ উপলব্ধি ভারতও বহু আগেই করেছিল যার কারণেই হয়ত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। হয়ত এটা একমাত্র কারণ নাও হতে পারে।

এ লেখার উদ্ধৃতি এ জন্য অবতারণা করলাম যে, আমরা আমাদের স্বাধীনতা ভারতের সাহায্য ব্যতিরেকেই লাভ করতাম হয়ত আরও সময় লাগত। আরও রক্ত ঝড়ত। আমার আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমি ১৯৭১ সনে

যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের শিয়ালকোটে সেক্টরে একটি আর্টিলারী রেজিমেন্টে ছিলাম। ঐ ইউনিটটি যুদ্ধের আগেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে শিয়ালকোটে আসে যার সাথে কিছু বাঙালী সৈনিক ও দু' একজন অফিসারও ছিল। আমাকে যুদ্ধের মধ্যেই কড়া পাহাড়ায় লাহোর থেকে শিয়ালকোটে ঐ ইউনিটে পাঠানো হয়। ঐ ইউনিটে থাকাকালে অধিনায়েকের সাথে যুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনা এবং ঐ ইউনিটের 'পূর্ব পাকিস্তানে' থাকাকালীন সময়ের কার্যকলাপ নিয়ে প্রচন্ড বাকবিতন্ডা হত। অনেক সময় আমাকে সেখানে উপস্থিত বাঙালী অফিসারগণ নিবৃত্ত করার চেষ্টা করত। এক সন্ধ্যায় ইউনিটের 'ফিল্ড মেসে' খাবারের সময় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা উঠলে অধিনায়ক হঠাৎ করে তাঁকে ভারতীয় চর বলাতে আমি এত উত্তেজিত হয়ে যাই যে, অধিনায়ক আমাকে গ্রেফতার করার হুমকি দেয়াতে আমি খাবার টেবিল ছেড়ে চলে যাই। সেখানে উপস্থিত দু'জন বাঙালী অফিসারদের মধ্যে একজন এখন বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে উচ্চপদে চাকুরিরত আছেন তিনি আমাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। দেশে ফিরে আসার সাথে সাথেই সকলেই যে ধারণাটা দিয়েছিল যে, তৎকালীন শাসক আওয়ামী লীগই ভারতের সাথে অসমচুক্তির জন্য দায়ী আর এর ফলে বাংলাদেশ ভারতের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনই এবং আজও বিশ্বাস করিনা যে এরূপ একটা চুক্তি বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খানকে (Holiday-র সম্পাদক) তাঁর গ্রেফতার হওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিলেন, "My hands were tied [২] তাঁর উপলব্ধিই ঠিক ছিল আর এ জন্যই হয়ত তাকে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

এটা একটা বড় আকারের বিশ্লেষণ হতে পারত কিন্তু এখানে এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এতগুলো ঘটনা আর বিশ্লেষণ তুলে ধরলাম সংক্ষেপে এ জন্য যে, ডালিমের কথায় বুঝা গিয়েছিল সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান Anti Indian feelings কে কাজে লাগানো হয়েছিল ১৫ই আগস্টে ও পরবর্তী অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানগুলোতে।

২। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় এনায়েতউল্লাহ খান এর এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, প্রকাশ কাল ১৯৭৫ সালের আগস্ট/সেপ্টম্বরের সংখ্যায়।

ডালিমের সাথে কথা বলতে বলতে এবং তার বক্তব্যের বিষয়গুলো চিন্তা করতে করতে সিএমএইচ এর প্রধান ফটক পেরিয়ে Main Building এ পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে এক মজার দৃশ্যের অবতারণা হল। ডালিমের খবর শুনে অনেক উৎসুক অফিসার ও সৈনিককে দৌড়ে দেখতে আসতে দেখে মনে হল যেন সে রূপকথার এক রাজপুত্র। শুধু তাই নয় অনেক সিনিয়র অফিসারকেও নির্লজ্জভাবে ডালিমের তোষামোদ করতে দেখলাম। বিচিত্র মানুষের চরিত্র। আমি সিএমএইচ থেকে ফিরে ডালিমের সাথে আমার কথোপকথনের সারসংক্ষেপ কমান্ডারকে জানালে তিনি সমগ্র বিষয়টি কিভাবে নিলেন তা বুঝতে পারলাম না।

১৬ই আগস্ট থেকে প্রায় প্রতি নিয়তই সেনাসদরে কনফারেন্স হত। সেখানে হয় ফারুক না হয় রশীদ অথবা ডালিমকে সেনাসদরে বেশীরভাগ সময় উপস্থিত থেকে প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলতে শোনা যেত।

ক্রমেই উত্তেজনা প্রশমিত হলেও সমগ্র পরিস্থিতি তখনও অনিশ্চিয়তার মধ্যে থেকে যায়। দেশের সমস্ত কর্মকান্ড সেনানিবাসের মধ্যেই যেন আবদ্ধ হয়ে থাকে। মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ সেনাপ্রধান থেকে গেলেন ২৪ আগস্ট পর্যন্ত যখন তার বদলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধানের পদে এবং ভারতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রশিক্ষণরত কর্নেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে পর্যায়ক্রমে ব্রিগেডিয়ার তার পরে-পরেই মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে উপ-প্রধান বানানো হল। এতগুলো দিন সেনাপ্রধান এক রকম নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন এমনকি তিনি সেনাসদর ছাড়া বাইরে অন্যান্য সৈনিকদের সাথেও সমাবেশ করেননি। আর এই অবস্থার প্রেক্ষিতে Chain of command এত শিথিল হয়ে পড়ল যার দরুন সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং অনেক গোপন সংগঠন দ্রুত তৈরী হতে লাগল। অভ্যুত্থানে জড়িত অফিসাররা বঙ্গভবনেই বাস করা শুরু করল আর তাদের মধ্যে পালা করে একজন রাষ্ট্রপতির সাথেই থাকত। বঙ্গভবন গার্ড দিয়ে রাখছিল ফারুকের বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিট। অবশ্য আরও অনেক পরে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের এক কোম্পানী পাঠানো হয় ল্যান্সার সৈনিকদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য। এক কথায় সর্বক্ষণের জন্য খন্দকার মোশতাক অভ্যুত্থানকারী অফিসার আর জওয়ানদের দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। In one word

he was virtually surrounded by coup leaders.

অভ্যুত্থানকারী অফিসারগণ ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার এবং তার অধীনস্থ ইউনিটগুলোকে তাদের বলয়ে না আনতে পারাতে ৪৬ ব্রিগেডকে বিশ্বাসও করতে পারত না। আর এ ব্রিগেডের উপর অবিশ্বাস থেকে যায় শুরু থেকেই যার কারণে ধারণা করে নিয়ে ছিল যে, কোন পাল্টা অভ্যুত্থান হলে তা হবে এই ব্রিগেডের তরফ থেকে। আর তার বিশেষ কারণ ঢাকায় অবস্থানরত সব পদাতিক ইউনিটগুলো ছিল ৪৬ ব্রিগেডের অধীনে। আর ৪৬ ব্রিগেডকে কাউন্টার করার জন্যে সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসের দিকে কর্নেল মান্নাফকে (পরে মেজর জেনারেল ও বর্তমানে রাষ্ট্রদূত) অধিনায়ক করে ঢাকায় সংগঠন করা হল নতুন এক ব্রিগেড, ৭৭ ব্রিগেড যার অধীনে তখনও কোন ইউনিট দেয়া হয়নি। স্মরণযোগ্য যে, কর্নেল মান্নাফ ছিলেন সিনিয়র ট্যাংক অফিসার যার একজন সদস্য মেজর ফারুক রহমান। তাছাড়া মান্নাফ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে জিয়ার সাথে ফারুকের প্রশিক্ষকও ছিলেন।

এসব রদবদলের পর নতুন সেনা প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বিভিন্ন সেনানিবাসে এবং ঢাকায় একাধিকবার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি কয়েকবার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারেও আসেন। জেনারেল ওসমানীও কয়েকবার বিভিন্ন সময়ে অফিসারদের সম্বোর্ধন করে সরকারের বিভিন্ন প্রয়াসের কথা বর্ণনা করতে থাকেন। এর প্রায় দু মাস পরে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারকে সরিয়ে জামার্নীতে অবসর যাপনকারী তোয়াবকে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত করে বিমান বাহিনী প্রধান করা হল।

এতসব রদবদলের পরে দেশে অস্থিরতা, অনিশ্চিয়তা আর সশস্ত্রবাহিনীতে ক্ষমতার দ্বন্দের শেষ হয়নি। যে ক্ষমতার শূন্যতা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যা পর তার দাবীদার শুধু একা খন্দকার মোশতাক রইলেন না। সেনাবাহিনীতে ত্রিমুখী স্রোত বইতে শুরু করল। প্রথমতঃ সেনাপ্রধান যিনি তার চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য জুনিয়র অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয় ছিলেন, তিনি হলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, শক্তিশালী সিজিএস এবং ফোর্স কমান্ডার সাফায়াত জামিল যারা খোলাখুলি Restablishment of chain of Command এর কথা বলতেন।

আর অন্যদিকে কর্নেল (অবঃ) তাহেরের নেতৃত্বে জাসদের গোপন সৈনিক সংগঠন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। শেষোক্ত গ্রুপ বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর এবং সেনাবাহিনীতে Chain of Command ভঙ্গ হওয়াতে দ্রুতগতিতে তাদের সংগঠনের কর্মকান্ড এগিয়ে নিতে পেরেছিল। এ ত্রিমুখী ক্ষমতার দ্বন্দ্বই জন্ম দেয় ৩রা নভেম্বরের রক্তাক্ত সৈনিক বিপ্লব ও পরবর্তী ছোট বড় ২১ টি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের, যার পরিসমাপ্তি হয় মেজর জেনারেল মঞ্জুর কর্তৃক সংগঠিত চট্টগ্রামে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে যাতে প্রাণ দিতে হয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের। এ স্বল্প সময়ের পরিসরে সশস্ত্রবাহিনীর রক্ত ঝরে, প্রাণ দিতে হয় অনেক অফিসার ও জোয়ানদের। যার মধ্যে অনেকেই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন মাত্র। তারা জানতেও পারেননি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া আর কোন অপরাধ করেছিলেন কিনা।

বাম দিক হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তোফায়েল আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধুর সাথে তৎকালীন নৌবাহিনীর প্রধান কমোডোর (রিয়ার এডমিরাল) এম

ন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল আহমে

দের সাথে বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাক আহমদ রা

চার

বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আর এ সশস্ত্র সংগ্রামের পুরোধা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী হতে বিদ্রোহী কয়েকটি ইনফেনট্রি ব্যাটালিয়ন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামে খ্যাত, আর হাতে গোনা বাঙালী অফিসার ও জওয়ানরা। এদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ যার নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দী থাকা অবস্থায় দেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে দুটি শক্তি পাশাপাশি গড়ে উঠে। একটি রাজনৈতিক শক্তি আর অপরটি সামরিক শক্তি। শেষোক্ত শক্তি সম্মুখ সমরে পাকিস্তানীদের মোকাবেলা করে। স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি বাহিনীর সদস্য, বিশেষ করে সামরিক অফিসার ও অন্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ত্যাগ আর দেশ প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় হয়। এ যুদ্ধ চলে অনেকটা সক্রিয় পরিস্থিতিতে যদিও অনেক পরে কর্নেল ওসমানিকে, যিনি বহুপূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তাঁকে যুক্তিযুদ্ধের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবুও প্রতিটি সামরিক সেক্টর এবং সেক্টরে কমান্ডারদের স্বকীয় সত্তা ও ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে। এমন কি সেক্টর ফোর্সের নাম করণও করা হয় সেক্টর কমান্ডারদের ইংরেজী আদি অক্ষর দিয়ে যেমন 'এস' (ফোর্স সফিউল্লাহ) জেড ফোর্স (জিয়াউর রহমান) 'কে ফোর্স' (খালেদ মোশারফ)। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সামরিক শক্তির সমন্বয়ের অভাবে একটা দূরত্ব বাড়তে থাকে। এর অনেক বৃত্তান্ত পরে একাধিক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মুখে শুনেছি। উদাহরণ স্বরূপ আজও সমগ্র জাতি দ্বন্দ্বে ভুগছে কে স্বাধীনতার আসল ঘোষক। বঙ্গবন্ধুর হয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা, না সামরিক নেতা মেজর জিয়া। সমগ্র জাতি আজও এ বিষয়ে একমত পোষণ করতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও

স্বাভাবিকভাবে সেনাবাহিনী সংগঠিত হওয়ায় তাদের আকাঙ্খাও অনেক বেড়ে যায়। বিজয়ের গৌরবের বড় অংশীদার হিসেবে মনে করাটাই সেনাসদস্যদের জন্য ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই সেনাবাহিনীর বীর সৈনিকরা চলে যায় পেছনের কাতারে যদিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেয়া হয় দু বছরের জ্যেষ্ঠতা কিন্তু এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেননি অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররাও। স্বভাবতই দেশগড়ার কাজে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজন থাকলেও সেটা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারেননি বা করতে চাননি বরং স্বাধীনতার পর অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিরূপ বক্তব্য বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সমগ্র সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হয় এডহকভাবে।

স্বাধীনতার পরপরই সেনাবাহিনীর পাশাপাশি দক্ষ পুলিশ প্রশাসন না গড়ে রক্ষীবাহিনী সংগঠিত করাকে এবং ঐ সংস্থাকে সেনাবাহিনীর সমান্তরাল বাহিনীতে পরিণত করার প্রয়াসও Counter Productive হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতার পরপরই বহু সংখ্যক রাজনীতিবীদের দুর্নীতি সশস্ত্রবাহিনীর সকল স্তরে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। স্বাধীনতার পর সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, এটা এখনও বিদ্যমান। সমগ্র দেশে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে এবং দিনে দিনে পরিস্থিতি অবনতির দিকে যেতে থাকে। এসব বিশৃঙ্খল অবস্থা সশস্ত্রবাহিনীর উপরে প্রভাব ফেলে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব,রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবী সশস্ত্রবাহিনীকে পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর মত সমাজ থেকে আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে পাকিস্তান হতে প্রত্যাগমনের পর সশস্ত্রবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায় আর তার সাথে নতুন মাত্রার সংযোজন হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দু বছরের জ্যেষ্ঠতা দেয়ার অশুভ পরিণতি হিসেবে সশস্ত্রবাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। যার জের আজও বিদ্যমান। এ বিভক্তির সূত্রপাত হয় সমগ্র সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ মুক্তিযোদ্ধা আর অমুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অসামঞ্জস্যভাবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে দেশে ফিরে আসার পর অফিসার ও জওয়ানরা তাদের এককালের জুনিয়র হতে শুধু চাকুরিতেই জুনিয়র হননি বরং কমিশনের তারিখ থেকে সমস্ত চাকুরি জীবনের জন্য দু বছরের জুনিয়র হয়ে যান। অনেকেই এ ব্যবস্থা সাথে খাপ

খাওয়াতে না পেরে চাকুরি ছেড়ে দেন। আর যে সমস্ত সদস্য দেশের ও নিজের কথা ভেবে এ ব্যবস্থা অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হন। বরং তারা চাকুরিতে নিজের দেশের ও সসস্ত্র বাহিনীর স্বার্থে এই বিভক্তির উর্দ্ধে থেকে, সসস্ত্রবাহিনীকে পুনঃগঠনের জন্য স্বস্ব ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখেন এবং বাংলাদেশ সসস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতই স্বাধীনতা উত্তর সংগঠনের জন্য বলিষ্ঠ অবদান রাখেন। প্রত্যাগত এ সব সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণের অদম্য উ ৎসাহ, দেশের প্রতি মমত্ববোধ আর দেশ প্রেম থাকা সত্ত্বেও শুধু মাত্র ভৌগোলিক দূরত্বের জন্যই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এসব সদস্য প্রায় দেড় থেকে দু বছর পর্যন্ত সপরিবারে পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যাম্পে থেকে অসহনীয় মানসিক ও কোন কোন ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করে অনিশ্চয়তার মধ্যে পরিবার নিয়ে কাটিয়েছেন শুধুমাত্র নিজের দেশের মায়ায়। তারা কপদর্কহীন হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এদের মধ্যেও যারা পেরেছেন পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এত ত্যাগের পরেও নিজের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করতে হয়। এটা শুধু দুঃখজনকই নয় দেশের জন্য শুভ বলে প্রমাণিত হয়নি। এতে দেশের মধ্যে যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে তা পরবর্তী প্রজন্মকেও সজ্ঞানে অজ্ঞানে বেঁধে ফেলেছে। আজ নতুন প্রজন্মের মধ্যেও এ বিভেদের বীজ বপন করা হচ্ছে নব নব নামে। এটা দেশের জন্য সুখকর হতে পারে না, হতে পারে না মংগলজনক। পাকিস্তানের অঙ্গ হিসেবে থাকাকালে চাকুরি জীবনে সমস্ত বাঙালী ঠিক একই ধরনের মনোকষ্ট নিয়ে জীবনের বিভিন্ন পেশায় কাজ চালিয়ে যায়। প্রত্যাগত সৈনিক বৃন্দও নিজের দেশে ফিরে এসে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা প্রশ্নের জেরে একই ধরনের মানসিক দ্বন্দের মধ্যে চাকুরি করতে থাকেন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও একজন সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, তার সুলিখিত পুস্তক A tale of Millions এ বিস্তারিত লিখেছেন, "The situation of Benglalis in Pakistan was worse. The were driven out of their homes with their families, herded into concentration camps, mistreated humiliated, abused and insulted and some were even tortured beyond imagination.Medical facilities were witheld,other facilities were with held. Other amenities virtually cutof. They were

forced to sell their valuables, specially gold ornaments at throwaway prices, only to buy essential items at exorbitant price. They were left with no option. It was almost impossible for them to escape. Yet they tried, some succeeded, others were caught, taken prisonar, isolated and tortured. The attempts of few symbolised the spirit of all of them. Their passage through seemingly unending days of humiliation and agony was silent and memorable. Their sacrifice is equally great. দুঃখের বিষয় যে এ বিভক্তি রাজনৈতিক নেতৃত্বও সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্য ব্যবহার করেন। এত প্রতিকূলতার মধ্যেই সমসাময়িক সময়ে সশস্ত্রবাহিনীর সংগঠন দেশের যে কোন সংগঠন, এমনকি রাজনৈতিক সংগঠন থেকেও শক্তিশালী ও cohesive body হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। অপরদিকে রাজনৈতিক সমাজ বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হতে থাকে যার প্রভাব পড়ে রাজনৈতিক 'কালচারের' উপরে। একটি দেশের রাজনৈতিক 'কালচার' যত দুর্বল হতে থাকে সেদেশের সশস্ত্রবাহিনীর মত সুসংগঠিত একটি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একটি শক্তিতে পরিণত হয়। আর তেমনি অবস্থারই প্রেক্ষিতে পটভূমি তৈরি হয় ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টে ঘটে যাওয়া অভ্যুত্থান ও তার পরবর্তী অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের অধ্যায়। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে সুপ্ত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব স্বাধীনতার পর থেকেই বিদ্যমান ছিল। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয় যা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সহজভাবে নিতে পারেন নি । তৎকালীন সিনিয়র অফিসারগণ সকলেই মুক্তিযুদ্ধে সমকক্ষ থেকে যুদ্ধ করেন এবং বিশেষ অবদান রাখেন। এদের মধ্যে উল্লেখ্য সফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ, মঞ্জুর, শওকত। স্মরণযোগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সকলেই সম্পদ বীর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। আর মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতা অর্জন করেন। অন্যদিকে কর্নেল তাহের ও কর্নেল জিয়াউদ্দিন ভিন্ন ধারায় এবং ভিন্ন আদর্শে মুক্তিযুদ্ধকে মূল্যায়ন করেন। স্বভাবতই স্বাধীনতার পরও প্রত্যেকেই নিজ বলয়ে থেকে প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ও সুযোগ সৃষ্টি করতে থাকেন। প্রত্যাগত অনেক অফিসারও এ ধরনের প্রভাব বলয়ের

বাইরে থাকতে পারেননি। এদের বেলায় হয় পূর্ব পরিচিতি অথবা কোর্স মেট হওয়াতে বিভিন্ন বলয়ে অবস্থান নেয়। তবে তরুণ অফিসাররা তারুণ্যের সহজাত Instinct, purity ও flambouyancy ধরে রাখার চেষ্টা করে যা সৈয়দ ফারুক রহমান, রশীদ, ডালিম, শাহরিয়ার, হুদার মত অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। অনেক তরুণ অফিসারই Young turks হিসেবে নিজেদের ভাবতেও শুরু করে। তারা নিজেদেরকে Reformist ও Revolutionary ভাবতে ভালবাসত। তৎকালীন সিনিয়র ও মধ্যপদবীর অফিসার, বিশেষ করে মেজর বা ইউনিট উপ-অধিনায়ক পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে ক্রমেই দূরত্ব আর মত পার্থক্য বাড়তে থাকে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মত যে, সেনাবাহিনীতে ঐ সময়ের বেশীর ভাগ অফিসার ১৯৬৫ সনের পরের কমিশনপ্রাপ্ত এবং বয়সে ছিল সমসাময়িক।

There was a distinct generation gap between senior and junior officers of that time, irrespective of Freedom Fighters or Repatriated officers. এর কারণ হল ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের পর অধিক সংখ্যক বাঙালী অফিসার তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। প্রসঙ্গত ১৯৬৫ সনের পরে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর Pakistan Military Accademy তে হ্রস কোর্স (Short duration Course) প্রবর্তন করা হয় যার ফলে যেখানে দু বছরে চারটি রেগুলার কোর্সের প্রশিক্ষণ দেয়া হত সেখানে একই সময়ে প্রায় ১২ থেকে ১৪টি কোর্সের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত ২৪টি হ্রস কোর্স ও রেগুলার কোর্স-এর ক্যাডেট পাশাপাশ কমিশন প্রাপ্ত হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তৎকালীন কমান্ডার এবং সিনিয়র লেভেলের অফিসারদের মধ্যে সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ সংগঠন নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। উল্লেখ্য, তাহের ও জিয়াউদ্দিনের আদর্শ ও ধ্যান ধারণা ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের, বিশেষ করে চীনের Peoples liberation Army এর মত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনকে বর্জন করে একটি গণবাহিনীতে পরিণত করা। আর এ বিষয়ে তারা প্রকাশ্যে বক্তব্য পত্রিকান্তরে তুলে ধরতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কর্নেল (অবঃ) জিয়াউদ্দিন তার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সর্বহারা পার্টিতে

যোগদান করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। আর কর্নেল (অবঃ ও প্রয়াত) তাহের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (JSD) দলের অন্তরালে ধীরে ধীরে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায়। ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে যে শূন্যতা বিরাজ করছিল তার কারণেই শুরু হয় এ ত্রিমুখী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, এই ত্রিমুখী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজ বিরাজমান Low Political coulture এর জন্যে আত্মসমর্পন করেন শাসনতন্ত্র বর্হিভূত শক্তির নিকট বাংলাদেশের অনেক গবেষক এবং প্রখ্যাত লেখকবৃন্দ ১৯৭৫ এর ঘটনাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা থেকে বিরত থেকেছেন।

রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যক্তি স্বার্থ, উচ্চাভিলাষ আর আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বিকাশের অন্তরায় হয় বলে আমি মনে করি। যদিও এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করার মত রাজনৈতিক জ্ঞান আমার নেই তবে আমার এ বক্তব্যকে অতি সাধারণভাবে বুঝাবার জন্য আমি সামান্য উদাহরণ টানতে চাই। ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক দলের সিংহভাগ মন্ত্রী পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মোশতাকের মন্ত্রীপরিষদে যোগ দেন। সংসদ সদস্যগণও তাদের নিজস্ব পদবীতে বহাল থাকেন। এক কথায় গুটি কয়েক ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সকলেই সেদিনকার অভ্যুত্থানকে গ্রহণ করে স্বীকৃতি জানান। সেদিন যদি সকলেই মন্ত্রী পরিষদে যোগদান থেকে বিরত থাকতেন তাহলে পরিস্থিতি হয়ত অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও তৎকালীন সেনাপ্রধানকে এবং সেনাবাহিনীকেই এককভাবে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্যে দায়ী করে বক্তব্য বিবৃতি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যে বিষয়টি আলোকপাত করা হচ্ছে না, তা হল, সেনাপ্রধান বা সেনাবাহিনীকে যে রাজনৈতিক Decision দেয়া উচিত ছিল তা তখন, মানে অভ্যুত্থানের পরপরই বিদ্রোহ দমনের রাজনৈতিক Decision দেয়ার দায়িত্ব কার ছিল বা আদৌ দেয়ার মত নেতৃত্ব সেদিনকার ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে কারও ছিল কিনা এ কথার কোন সদ উত্তর কেউ দিতে চাননা। একইভাবে ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সময়েও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে এক

রাজনৈতিক পার্টি হতে আরেক পার্টিতে যোগদানের ধারার যে সূচনা হয়েছিল আজও তা অব্যাহত রয়েছে। এটাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির দুর্বলতা বা Low Political Culture হিসেবে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। আর এর পরিণতি হিসেবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল হয় অসাংবিধানিক শক্তি দ্বারা যা প্রায় বেশীর ভাগ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সে সময়ে ঘটে চলেছিল। এ বিষয়টির উপর বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়, SE Finer রচিত 'Man on the Horseback' পুস্তকে।

১৫ই আগস্টের পরবর্তী ঘটনাগুলো তুলে ধরার পূর্বে আমার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ শেষ করতে চাই সেনাবাহিনীর তৎকালীন সংগঠন ও Chain of command এর উপর কিছু আলোকপাত করে।

পাঁচ

আগেই বলেছি সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর চলছিল এডহক বেসিসে। ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৫টি পদাতিক ব্রিগেড (৩টি ব্রিগেডে একটি ডিভিশন হয়) একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড, একটি আর্টিলারী ব্রিগেড ও একটি লজিস্টিক এরিয়া ছিল। ব্রিগেডই তখন ফিল্ড ফরমেশন হিসেবে সেনাবাহিনীর বৃহৎ সংগঠন ছিল। এর মধ্যে একটি পদাতিক ব্রিগেড, ৪৬ ব্রিগেড ঢাকায় যার অধীনে ৪টি পদাতিক ও একটি আর্টিলারী ইউনিট ছিল অন্যদিকে যশোর, রংপুর, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামে একটি করে পদাতিক ব্রিগেড ছিল। যার অধীনে গড়পড়তা তিনটি পদাতিক ইউনিট ও একটি করে আর্টিলারী ইউনিট ছিল। তৎকালীন সময়ে ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল সাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, যশোহরে ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী বীর উত্তম, রংপুরে কর্নেল কে এন হুদা বীর বিক্রম, কুমিল্লায় আমজাদ আহমেদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রামে ব্রিগেডিয়ার গোলাম দস্তগীর। ঢাকার লগ এরিয়া কমান্ডার ছিলেন কর্নেল মইনুল হোসেন। ব্রিগেড কমান্ডারদের মধ্যে আমজাদ এবং দস্তগীর ছাড়া বাকি চারজন ছিলেন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা। এখানে আরও উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ চাকুরিতে ও বয়সে আমজাদ ও দস্তগীর থেকে অনেক তরুণ ছিলেন এবং শান্তিকালীন সেনাবাহিনীর ফরমেশন পরিচালনায় তাদের চাকুরির আলোকে অভিজ্ঞতাও কম ছিল। ব্যাটালিয়নগুলোর প্রত্যাগত কমান্ডারগণ ছাড়া বাকি মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডার চাকুরিতে কম অভিজ্ঞতা আর বয়সেই ছিলেন নবীন। বেশীর ভাগ কমান্ডিং অফিসাগণের ইউনিট পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল স্বল্প। সেনাবাহিনীতে কমান্ড লেভেলে অভিজ্ঞতা কম থাকাতে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হত অথবা ঠিক সময়মত সিদ্ধান্ত পেতে দেরী হত। এ ধরনের অনেক ঘটনাই ঘটে

যা Military Norm এর পরিপন্থী যেখানে ব্রিগেড কমান্ডারগণও শিথিল মনোভাব গ্রহণ করতেন বা করতে বাধ্য হতেন। অল্প কথায় সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সমগ্র সেনাবাহিনীই ছিল কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এ কম অভিজ্ঞতার কারণে পরবর্তীতে সংকটকালীন সময়গুলোতে বিভিন্ন স্তরের কমান্ডারগণ এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করতেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন Armed forces is not a democratic institution rather a monolethic institution সেখানে সর্ব পর্যায়েই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব শ্রেণীভেদে কমান্ডারগণেরই। এখানে সমষ্টিগত বা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার অবকাশ কম।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার কর্নেল মইনুল হোসেন (মেজর জেনারেল ও বর্তমানে রাষ্ট্রদূত) এবং কর্নেল সাফায়াত জামিলের (অবসর প্রাপ্ত) অধীনে স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। দু'জনকেই অত্যন্ত সৎ, কর্মঠ ও শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন অফিসার হিসেবে দেখেছি। বয়সে কম ও চাকুরির অভিজ্ঞতা কম হলেও তারা তখনকার পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে তৈরী করে নেয়ার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে সাফায়াত জামিলের সাথে আমি ১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত ছিলাম। তাকে আমি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে আজও শ্রদ্ধা করি। তার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল। তবে মাঝে মধ্যে তাকে আমার ধারণায় বেশ আবেগপ্রবণ মনে হত। এখানে উল্লেখ করতে চাই কমিশন প্রাপ্তি থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সাফায়াত জামিল ও খালেদ মোশরফ একই ইউনিটে চাকুরি করেছেন। সাফায়াত জামিল বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন বলে আমার কাছে মনে হত। তিনি প্রায়শই বঙ্গবন্ধুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকারেও মিলিত হতেন।

১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানকে প্রথম থেকেই সাফায়াত জামিল মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তার উর্ধ্বতন কমান্ডারের কোন দিক নির্দেশনা না থাকাতে তার চুপ থেকে হজম করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিলনা। ব্রিগেডিয়ার খা-লেদকে প্রথমদিকে বেশ কিছুটা উৎসাহিত দেখা গেলেও ক্রমে ক্রমে তিনিও Chain of Command এর বাইরে থেকে অভ্যুত্থানকারি অফিসারদের কার্যকলাপ মেনে নিতে পারছিলেন না। তার এ পরিবর্তন আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য

করি সফিউল্লাহর স্থলে জিয়াউর রহমান সেনা প্রধান করার পর থেকে। খালেদ মোশারফ এবং সাফায়াত জামিল দু'জনে Chain of command ঠিক করে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা প্রকাশ্যে বলতেন। সাফায়াত জামিল সেনাসদরের বিভিন্ন কনফারেন্সেও একাধিকবার নানাভাবে বলেছেন কিন্তু সেনাসদর থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি কারণ জিয়াউর রহমান দু' একবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেননি। অক্টোবরের শেষের দিকে এমন পরিস্থিতি হল তাতে মনে হত সমগ্র সশস্ত্রবাহিনী ফারুক, রশীদ ও ডালিমের কথায়ই চলত আর সে সাথে সমস্ত দেশ কয়েকটি Tank আর কিছু সেনা অফিসারের হাতে জিম্মী। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের উপরে আরও দু'জন ওসমানী ও খলিলকে চাপিয়ে দেয়াতে তিনিও অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন এবং Wait and see policy তেই চলছিলেন। এমনি পরিস্থিতি আর সাফায়াত জামিলের বিরূপভাব সমগ্র সেনাবাহিনীতে এবং বঙ্গভবনে অবস্থানকারী অফিসারদের মধ্যে পোক্ত ধারণা জন্মায় যে, কোন পাল্টা আঘাত আসলে তা আসবে সাফায়াত জামিল ও তার ৪৬ ব্রিগেডের তরফ হতে আর সাফায়াত জামিল হয়ত সে সুযোগের অপেক্ষায়ই রয়েছেন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে, যেমনটা আগেই বলেছি, সংগঠন করা হয়েছিল ৭৭ ব্রিগেডের তবে ঐ ব্রিগেড তখনও ৪৬ ব্রিগেডকে কাউন্টার করার মত সাংগঠনিক ভাবে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। তবে সাফায়াত জামিলও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার। অক্টোবরের মাঝামাঝি সাফায়াত জামিল নিশ্চিত হলেন যে, সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এ ধরনের কোন কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান না বা আরও সময় নিতে চান। আর যে পরিস্থিতি চলছে তা এভাবে চলতে থাকলে সেনাবাহিনীতে Discipline বলতে কিছুই থাকবেনা। সাফায়াত জামিল এসব নিয়ে পরবর্তী সময়গুলোতে খালেদ মোশরফের সাথেই পরামর্শ করতে শুরু করলেন। অক্টোবরের শেষের দিকে নিশ্চিত হলাম যে, সাফায়াত জামিল প্রয়োজন বোধে খালেদ মোশরফকে নিয়েই কিছু করতে যাচ্ছেন। প্রয়োজন বোধে বল প্রয়োগ করে হলেও অভ্যুত্থানকারী অফিসারও ল্যান্সার ইউনিটের অবশিষ্ট ট্যাংক গুলোকে সেনাছাউনির অভ্যন্তরে ফিরিরে আনা হবে। অন্যদিকে এ রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সেনানিবাসে চলতে লাগল কর্নেল (অবঃ) তাহেরের গোপন সংগঠন 'বিপ্লবী

সৈনিক সংস্থা' র সাংগঠিনক কার্যক্রম। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তাতে কমান্ড চ্যানেলের দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেনানিবাসগুলোতে বিশেষ করে ঢাকায় অবস্থানরত নন ইনফেনট্রি ইউনিটগুলোতে গোপন সংগঠনের কার্যক্রম আরও ত্বরিতগতিতে সম্পন্ন হতে লাগল সবারই অজ্ঞাতে। সৈনিকদের মধ্যে সহজেই তাহেরের আদর্শ ও কার্যক্রম ব্যাপ্তি পেতে লাগল কারণ সৈনিকদের উত্তেজিত ও আকৃষ্ট করার মত ওয়াদা তাহেরের প্রচারপত্রে ছিল। একদিকে যেমন সেনাপ্রধান Wait and See Policy তে বিশ্বাসী ছিলেন আর এরমধ্যে ৩রা নভেম্বরের পটভূমি তৈরী হচ্ছিল, খালেদ মোশরফ আর সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে আর অন্যদিকে ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছিল তাহেরের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। জন্ম নিল ত্রিমুখী শক্তির আর গোচরে অগোচরে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব (Triangular Quest For power some were visible some were not visibel)

তাহেরের গোপন সংগঠন সেনাবাহিনীতে সংগঠিত হওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল আর তা হল সে সময়ে সেনাবাহিনীতে পদাতিক ইউনিটগুলো ছাড়া অন্যান্য ইউনিটগুলোতে সরঞ্জামের অভাবে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণও হতনা। সেনাবাহিনীতে উপকরণ এবং institution গুলো না থাকায় প্রশিক্ষণের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর আর প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তেমন অনুধাবন করা হয়নি। মনে পড়ে, ৪৬ ব্রিগেড, সমগ্র বাহিনীতে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত সেনা ছাউনির বাইরে প্রশিক্ষণে যায়। শান্তিকালীন সেনাবাহিনী সব সময়ের জন্যে প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকে। প্রশিক্ষণের অভাবে সেনাবাহিনীতে সকল স্তরের সৈনিকদের ছিল অফুরন্ত অবসর। আর অবসর সময় হাতে থাকাতেই, বিশেষ করে জওয়ানদের মধ্যে কর্নেল তাহেরের গোপন সংস্থা কাজ করতে থাকে। এর আরও দ্রুততা লাভ করে ১৫ই আগস্টের পর যখন সেনাবাহিনী দেশের রাজনীতির সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িয়ে পড়ে।

অক্টোবরের শেষের দিক থেকেই সবার একটা ধারণা জন্মায় যে, একটা পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা সেনানিবাসে এসব আলোচনা অনেকটা খোলাখুলিভাবেই হত। যেমনটা আগেই বলেছি সাফায়াত জামিল একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের কথা প্রায় খোলাখুলি বলতেন। তবে তার লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। ওদিকে বঙ্গভবনে অবস্থানরত ফারুক,

রশীদ, ডালিম ও অন্যান্য অফিসাররাও একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের ব্যাপারে ছিল সজাগ। তাদের ধারণা ছিল এ পাল্টা অভ্যুত্থান সেনা প্রধানের তরফ থেকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশী অথবা সেনাবাহিনীর আওয়ামী লীগ ঘেঁষা কোন গ্রুপ থেকে। উল্লেখ্য, তখন কয়েকটি ট্যাংক আর মেজর ইকবালের অধীনে ১ম বেঙ্গলের ১ কোম্পানী বঙ্গভবনের নিরাপত্তায় ছিল। বেঙ্গল ল্যান্সারের বাদবাকী ট্যাংকগুলোর কিছু সেনানিবাসে ফিরে আসে আর কয়েকটা সোরহাওয়ার্দী উদ্যানে রয়ে যায়। ১ম ইস্টবেঙ্গলের কোম্পানী বঙ্গভবনে মাত্র একমাস পূর্বে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত ১ম ইস্টবেঙ্গল জিয়াউর রহমানের ব্যাটালিয়ন বলে পরিচিত ছিল কারণ তিনি তরুণ অফিসার হিসেবে এই ইউনিটে চাকুরি করেন এবং ১৯৬৫ সনে পাকভারত যুদ্ধের সময় লাহোর রণাঙ্গনে এই ইউনিটের সাথেই যুদ্ধ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জেড ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকভারত যুদ্ধের সময় এই ইউনিটের বীরত্ব লাহোরবাসীর মুখে মুখে ছিল। এই ইউনিটই যা ১৯৬৫ সনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমস্ত ইউনিটের মধ্যে বীরত্বের জন্যে সবার্ধিক পদক পায় যার রেকর্ড আজ পর্যন্ত ভঙ্গ হয়নি। এই ১ম বেঙ্গলের উপস্থিতিই বঙ্গভবনে কিছুটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ঘেঁষা সেনা অংশ থেকেও একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের গুজব এত বেশী ছড়াতে থাকে যে, ফারুক রশীদ গং এ অভ্যুত্থান খালেদ বা সাফায়াতের নেতৃত্বে হবে বলে ধারণা করতে থাকে। কার্যত তারা এ দু'জন অফিসার এবং ৪৬ ব্রিগেডের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছিল। এ প্রসঙ্গে এনথনি ম্যাসকারনিহাস তার পুস্তক Bangladesh : Legacy of Blood এ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এসব তৎকালীন সরকারের মধ্যেই জন্ম নেয় একটা সন্দেহ তা হল যদি সত্যই এ ধরনের কোন পাল্টা অভ্যুত্থান সফল হয় তবে ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত অফিসারদের পাল্টা ব্যবস্থা কি হতে পারে। প্রথমত: তাদের প্রয়োজন ছিল একটি আইনের যে আইনে তাদের অভ্যুত্থানকে যে কোন আদালতের বাইরে রাখা। আর যদি আওয়ামী লীগ সমর্থিত কোন অভ্যুত্থান ঘটে তাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়ার মত সিনিয়র নেতার অভাব ঘটানো। দু'টিই অত্যন্ত পরিপক্ক ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবস্থা তা স্বীকার করতেই হবে। ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানকে Legalised করার জন্য জারি করা হল বহু বিতর্কিত, The Indemnity Ordinance 1975 duly promulgated and signed by the President of the Republic on 26 September 1975. তবে এ

আইনে বিচার রদ হলেও পরবর্তী কোন মার্শাল ল কোর্টে বিচার হতে পারত কিনা সে ব্যাপারে আইন বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সক্রিয় পরিকল্পনা (Self Executing Plan) করা হয়। তার ফলে সংগঠিত হয় বাংলাদেশের তথা সভ্যজগতের নারকীয় ঘটনা, ৩রা নভেম্বরের জঘন্যতম জেল হত্যা (বিবরণ পরের অধ্যায়ে)।

অক্টোবরের মাঝামাঝি আমি একবার কোন কারণে বঙ্গভবনে যাই সেখানে রশীদের সাথে আমার দেখা হতে সে একটি পাল্টা অভুত্থানের কথা বলে তবে তাদের আশংকা ছিল আঘাত হয়ত ৪৬ ব্রিগেড থেকেই আসবে বলে তার বদ্বমূল ধারণার বহিঃপ্রকাশ করে আমার কাছে। তবে আমার কাছে যে বিষয়টি আজও পরিষ্কার নয় তাহল এত স্বচ্ছ ধারণা থাকা স্বত্ত্বেও কেন তারা ব্রিগেড কমান্ডার বা সিজি এসকে অন্যত্র সরাবার চেষ্টা করেনি বা আগস্ট অভ্যুত্থানের পরে পরেই কেনইবা ফরমেশন কমান্ডারদের রদবদল করেনি। প্রেসিডেন্ট, যিনি সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক তার পক্ষে এ ধরনের রদবদল করাটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হত না। হয়ত বা ফারুক, রশীদরা ভেবেছিল যে বেশীর ভাগ অফিসারাই তাদের পক্ষে রয়েছে এ আত্মবিশ্বাসের জোরেই এরকম রদবদলকে খুব গুরুত্ব দেয়নি। এমনও হতে পারে সশস্ত্রবাহিনীর মাথাভারি করার পর নিজেদেরকে কিছুটা নিরাপদ ভেবে থাকতে পারে। তবে CDS হিসেবে মেজর জেনারেল খলিলের ভূমিকা কোন দিনই স্পষ্ট হয়নি। অথবা হয়ত তারা জেনারেল ওসমানীর উপরে বেশী আস্থা রেখেছিল কিন্তু তিনি সমগ্র সেনাবাহিনীর উপরে প্রভাবের যে ধারণা করা হয়েছিল বাস্তবে তা কতখানি ছিল তা কেউ খতিয়ে দেখেনি। বাস্তবে জেনারেল ওসমানীর কোন প্রভাবই কার্যত সেনাবাহিনীর পরবর্তী পাল্টা অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করতে পারেনি।

যে আশঙ্কা নিয়ে ফারুক, রশীদ ও তাদের সতীর্থরা এতদিন কাটিয়েছে সে ঘটনারই সূত্রপাত হল ২ নভেম্বর মধ্যে রাতে যখন আস্তে আস্তে মেজর ইকবালের অধীনস্ত বঙ্গভবন পাহাড়ায় নিয়োজিত ১ম বেঙ্গলের কোম্পানি কোন কারণ দর্শানো বা বঙ্গভবনের নির্দেশ ছাড়াই পশ্চাদাপসরণ শুরু করল। যখন ফারুক, রশীদ এ পশ্চাদপসরণের খবর পেল তখন ঢাকা সেনানিবাসের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে পাল্টা অভ্যুত্থানের 'কমান্ড পোস্ট' স্থাপন সম্পন্ন হয়েছিল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে।

শুরু হল খালেদ আর সাফায়াত জামিলের বহুল আলোচিত Restoration of Chain of command অভিযান বা ৩রা নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থান।

ছয়

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ । সন্ধ্যার পর চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ (সিজিএস) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ টাঙ্গাইল টাস্ক ফোর্স হেড কোয়ার্টার থেকে ফিরলেন। টাঙ্গাইল এরিয়াতে তখন কর্নেল লতিফ কমান্ডার: বিমান বিধ্বংসী আর্টিলারীর তত্ত্বাবধানে আর্টিলারী ও ১৬ বেঙ্গলের সম্মিলিত অভিযান চলছিল কাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে। আব্দুল কাদের, এক কালের প্রাক্তন সৈনিক, যাকে সারা বাংলাদেশ বাঘাকাদের হিসেবে চেনে। যিনি মুক্তিযুদ্ধে এক বিরল অবদান রাখেন। যিনি দেশের ভেতরে থেকেই সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্ভাবিত পন্থায় টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ এলাকাকে শত্রু মুক্ত রাখেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন অনুরাগী এবং শক্তভক্ত। একমাত্র কাদের সিদ্দিকীই ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ জানাতে আরেক বার তুলে ধরেছিলেন হাতিয়ার আর ফিরে গেলেন তার মুক্তিযুদ্ধের অপারেশনাল এরিয়াতে। তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর আর্টিলারী ব্রিগেড ও একটি পদাতিক ইউনিটকে নিয়োজিত করা হয়েছিল।

খালেদ মোশারফ টাঙ্গাইল থেকে ফিরে আসার পর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার সাফায়াত জামিল আর তার অধীনস্থ পদাতিক ইউনিট গুলো নিয়ে সূচনা করলেন পাল্টা অভ্যুত্থান। আগেই বলেছি মুক্তিযুদ্ধের সময় খালেদ মোশারফ, সফিউল্লাহ আর জিয়াউর রহমান আর অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারগণ সমপদবী হলেও এ তিনজনের ইংরেজি নামের আদি অক্ষর নিয়েই তাদের সেক্টর ফোর্সের নাম করণ করা হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পরের দু'জন খালেদের সিনিয়র হওয়ার সুবাদে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে সেনাপ্রধান আর উপ-প্রধান হন আর খালেদ মোশারফ হন সিজিএস। ১৫ আগস্টের পরের পরিবর্তনে সফিউল্লাহর অবসরের পর জিয়াউর রহমান সেনা প্রধান হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসেন আর খালেদ মোশারফ তখনও জিয়াউর রহমানের অধীনে সিজিএস হিসেবে থাকেন।

খালেদ মোশারফের মত চৌকশ অফিসার হয়ত এ অবস্থায় বেশি দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না। সুযোগ আর সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। আর তখনকার অস্থির পরিস্থিতিতে সে সুযোগও তার হাতে এসে যায়। এ ব্যাপারটি প্রথমদিকে না হলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে সাফায়াত জামিলও বুঝতে পারেন. বিশেষ করে যখন কর্নেল কে এন হুদা কমান্ডার ৭২ ব্রিগেড সাফায়াত জামিলের অজান্তেই দ্রুতগতিতে রংপুর থেকে ঢাকায় ১০ই বেঙ্গল আর ১৫ই বেঙ্গলকে নিয়ে এবং নিজে লেঃ কর্নেল জাফর ইমামের (পরে মন্ত্রী) সাথে স্বশরীরে ঢাকা সেনানিবাসে পৌঁছেন।

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সনে যথারীতি ২ টার পর বাসায় ফিরে বিকেলে আবার অফিসে যাই। ফেরার পথে বিএম মেজর হাফিজের সাথে একই গাড়ীতে আসার সময় তাকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখলাম। সে আমাকে কিছু বলতে গিয়েও তেমন স্পষ্ট কিছুই বললনা। আমিও ঠিক বুঝতে পারলা না যে, সে রাতেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

৩রা নভেম্বর রাত ৩টার দিকে হঠাৎ আমার সামরিক ফোনটি বেজে উঠল। ঘুমন্ত চোখে রিসিভারটি কানের কাছে নিতেই অপর প্রান্ত থেকে বেশ রুঢ় গলায় আমার ব্রিগেড কমান্ডার সাফায়াত জামিলের আওয়াজ শুনলাম। তিনি বললেন যে, তিনি মাঝরাত থেকেই আমাকে খুঁজছেন কিন্তু কেউ আমার ফোনটি ধরেনি। অত্যন্ত রাগত স্বরে বললেন 'You are sleeping and I have been looking for you whole night. Report immedeately to 4 East Bengal office.' আর কিছু না বলেই টেলিফোনটি ছেড়ে ছিলেন। তাকে আমি উত্তেজিত স্বরে এর আগে আমার সাথে কথা বলতে শুনিনি। আমি বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু টেলিফোনে এর আগে কোন রিং আসেনি বা আমি পাইনি। এর কারণ অনেক পরে জানতে পারলাম যে, পাল্টা অভ্যুত্থানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেব কিছু টেলিফোন লাইন অকার্যকর করা হয় তারমধ্যে আমারটিও ছিল। হয়ত আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে আমার ফোনে পুনরায় সংযোগ দেয়া হয়। তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম চাপিয়ে রের হলাম। মনে করলাম হেঁটেই যাব কারণ এ অবস্থায় কাকেই বা খুঁজে পাব আর গাড়ীই বা কোথায় পাব। কপাল ভাল যে, আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকতেন মেজর মোমেন (পরে কর্নেল অবঃ এবং প্রতিমন্ত্রী) যিনি রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে আত্মীকরণ করার পর রক্ষী সদস্য

দ্বারা সংগঠিত সিগনাল ইউনিটের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তার সাথে দেখা হলে তিনি জানালেন কিছুক্ষণ আগে তাকে তার ইউনিট থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী আসে। কিছু একটা ঘটেছে সেটা তিনিও আঁচ করেছেন তবে বিস্তারিত আর কিছুই বলতে পারলেন না। আমি তার গাড়ীতে চেপেই ৪ বেঙ্গল লাইনের নিকট নামতেই দেখলাম অনেক গাড়ী কনভয় আকারে দাঁড়ানো আর ৪ বেঙ্গলের সৈনিকবৃন্দ যুদ্ধের পোশাকে সুসজ্জিত অবস্থায় গাড়ীতে বসা। কিছুদূর এগুতেই কোয়ার্টার গার্ডের সামনে ইউনিট অধিনায়ক লেঃ কর্নেল এ জে এম আমিনুল হক বীর উত্তম (অবসর প্রাপ্ত ও পরে ডিজি এনএসআই)-এর সাথে দেখা। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত অবস্থায় পায়চারি করছিলেন।

এ জে এম আমিনুল হক, যার সাথে পরিচয় আমার কমিশন প্রাপ্তির পরপরই। আমরা পাকিস্তানে একই সেনা ছাউনীতে কার্মরত ছিলাম। তাকে অত্যন্ত শান্ত মেজাজের, বন্ধুবৎসল লোক হিসেবে আমার কাছে ভালই লাগত। মুক্তিযুদ্ধে তিনি বেশীর ভাগ সময় জিয়াউর রহমানের অধীনে যুদ্ধ করেন।

আমি তাকে পায়চারি করতে দেখে পরিস্থিতি জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন 'কেন? তুমি জাননা?' আমি তাকে জানালাম যে, আমি কিছুক্ষণ আগে কমান্ডারের ফোন পেয়ে এই মাত্র এখানে পৌঁছলাম। কাজেই আমি ঘটনা কিছুটা আঁচ করলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। তিনি জানালেন, রাত প্রায় ১১টার দিকে কমান্ডার আর সিজিএস তাকে ডেকে আনেন সাথে আরও কয়েকজন অফিসারকেও আনা হয়। সেই থেকে সিজিএস অধিনায়কের অফিস থেকেই সমগ্র পাল্টা অভ্যুত্থান পরিচালনা করছেন এবং অধিনায়ককে (আমিন) বাইরেই থাকতে বলা হয়েছে। এমনকি তার অবর্তমানেই তার ইউনিটতে Stamd to করা হয়েছে। সংক্ষেপে আরও জানালেন বঙ্গভবনে নিয়োজিত ১ম বেঙ্গলের কোম্পানীটি পশ্চাদপসারণ করে সেনানিবাসে চলে এসেছে এবং সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করা হয়েছে। ঠিক ঐ সময়েই বঙ্গভবনের সাথে টেলিফোনে খালেদ মোশারফের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করে চলেছেন।

আমিনুল হকের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে আমি কমান্ডারের নিকট যাবার উদ্দেশ্যে ব্যাটালিয়ন অফিসে ঢুকতেই চোখে পড়ল উপ-অধিনায়কের রুমে বসা লেঃ কর্নেল মোমেন অধিনায়ক বেঙ্গল লান্স্যার যার উপ-অধিনায়ক ছিল ফারুক রহমান তবে তিনি ১৫ই আগস্টের পরে প্রমোশন পেয়ে বঙ্গভবনেই

থেকে যায় আর সেনানিবাসে ফিরে আসেনি। তবুও সমস্ত ইউনিটই তার প্রভাব বলয়ের মধ্যেই থেকে যায়। লেঃ কর্নেল মোমেনের সাথে ডিজিএফআই এর স্কোয়াড্রন লীডার আজিজও ছিলেন। কুশল বিনিময়ের পরে মোমেনের মুখেই শুনলাম তাদেরকে বাসা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে আর ইউনিটে যেতে দেয়া হয়নি। আর সে থেকেই তারা এক রকম বন্দী অবস্থায় আছেন। এর মধ্যে একবার খালেদ আর মোনের মাঝে বেঙ্গল ল্যান্সার নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। তাদের সাথে কথা সেরে সাফায়াত জামিল বারান্দায় বের হতেই মুখোমুখি হতেই তিনি উষ্মার সাথে আমার দেরীর কারণ জানতে চাইলেন। আমি কারণ জানাতেই রেগে বললেন 'You better be here and do your job otherwise I will arrest you.' আমি এর আগে তার এরূপ অগ্নিমূর্তি দেখিনি বলে কিছুটা ভড়কে যাই। আমি ভয়ে ভয়ে তার পিছু পিছু অফিসে ঢুকতেই দেখলাম খালেদ মোশারফ, তার সমনে বসা ব্রিগেডিয়ার (প্রয়াত) নুরুজ্জামান যিনি অবলুপ্ত রক্ষীবাহিনীর প্রধান ছিলেন, আরও বসা দেখলাম কর্নেল সবিহ্উদ্দিন (পরে ব্রিগেডিয়ার ও অবসর প্রাপ্ত) তিনিও অধুনালুপ্ত রক্ষীবাহিনীতে ছিলেন। সাফায়াত জামিল কিছুটা চিন্তিত ও বেশ ক্লান্ত অবস্থায়একটু দূরে বসলেন। খালেদ মোশারফ টেলিফোনে উত্তেজিত হয়ে বঙ্গভবনে মেজর রশীদের সাথে কথা বলছেন। তিনি দাবী করছিলেন আর বলছিলেন তার কথা যদি না মানা হয়, 'Extreme measures will be taken for which you (Rashid and Others) would be held responsible'. সেখানে তখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কিছুক্ষণ পর সবিহউদ্দিনের সাথে আমিও বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার মুখে এর আগে ঘটে যাওয়া বিস্তারিত বিবরণ শুনতে পারলাম।

বঙ্গভবনে পাহারারত ১ম বেঙ্গলের কোম্পানী সেনানিবাসে খালেদ মোশারফের হুকুমে রাত প্রায় ১২ টার দিকে সেনানিবাসে ফিরে আসে আর এ ঘটনা বঙ্গবভনে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই ইউনিটের আরএক কোম্পানী ক্যাপটেন হাফিজের অধীনে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্ধী করে। আর তার বাসভবনের টেলিফোন আগেই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল কিন্তু Bedroom extension টা থেকে যায়। সেখান থেকে বেগম জিয়া, এক পর্যায়ে জেনারেল ওসমানী জিয়াকে খুঁজলে তিনি জিয়ার গৃহবন্দী হওয়ার কথা জানাতে সক্ষম হন। এ ঘটনার বিবরণ Bangladesh: A Legacy of Blood - এ দেয়া আছে। বঙ্গভবন থেকে পদাতিক কোম্পানী পশ্চাদপদ হওয়ার পর থেকে

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ করে ওখানে পাহারারত Taank crew দের মধ্যে। ফারুক তাদেরকে আশ্বস্ত করতে থাকে তার পরও তাদের আতঙ্ক কাটেনি বিশেষ করে Tank crew রা ধরে নেয় যে তাদের পক্ষে পদাতিক বাহিনীর Antitank weapon গুলোর সামনে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না। এরই প্রেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত জায়গায় চলে যায় বঙ্গভবন রক্ষা করার জন্য। ফারুক চলে যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সেখানে আরও কিছু ট্যাংক আগের থেকেই রাখা ছিল। সেখান থেকে সেনাছাউনিতে অবশিষ্ট ট্যাংক এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। ২য় বেঙ্গল যার অবস্থান বেঙ্গল লান্স্যারের নিকটই, সতর্ক অবস্থায় ডিফেন্স নেয়। ১ম বেঙ্গল লেঃ কর্নেল মতিউর রহমানের নেতৃত্বে (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হয়। আমি আসার পূর্বেই এ রেজিমেন্টে এক ব্যাটারি বিমান বন্দর (তেজগাঁও) বন্ধ করে দেয়। কর্নেল সবিহ্‌উদ্দিনকে দিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সাহায্যে বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ রহিত করা হয়। পরে অবশ্য এ কাজের ভার গ্রহণ করেন কর্নেল চিশতি (পরে মেজর জেনারেল) যিনি ডাইরেক্টর সিগন্যালস ছিলেন। এদিকে ৪ বেঙ্গলের এক কোম্পানীকে সুসজ্জিত করে পাঠানো হয় বঙ্গভবনের ট্যাংকগুলো গতিরোধ করে প্রয়োজনে নিস্ক্রিয় করার জন্য। এ সমস্তই করা হয় Show of Force হিসেবে স্নায়ু চাপের সৃষ্টি করার জন্য। কখনও গৃহযুদ্ধ বা খন্ডযুদ্ধ ঘটানোর প্রচেষ্টা কেউই করেননি। একটি বিষয়ে খালেদ মোশারফ আর সাফায়াত জামিল যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন আর সেটা হল যে করেই হোক রক্তপাত এড়ানো।

৩রা নভেম্বর ফজরের সময় থেকেই শুরু হয় খালেদ মোশারফ আর রশীদের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ। পুনরায় শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। খালেদ মোশারফ কতগুলো শর্ত দিতে থাকেন আর সেগুলো পরে লিখিত ভাবেও বঙ্গভবনে পাঠানো হয়। দাবীগুলোর মধ্যে ছিল; (১) বঙ্গভবনে অবস্থানরত সমস্ত সামরিক অফিসারদের (অভ্যুত্থানে জড়িত) নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ (২) জিয়াউর রহমানকে সেনা প্রধান পদ থেকে অপসারণ করে নতুন সেনা প্রধান নিয়োগ করা। (৩) মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নিয়োগ দেয়া তবে এসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে খন্দকার মোশতাককেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল রাখা। (৪) এ পর্যন্ত মোশতাক সরকার যে সমস্ত নতুন নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন তা রহিত করণ। এসব দাবীদাওয়া খালেদ মোশারফ বঙ্গভবনে রশীদের মাধ্যমে মোশতাককে জানাতে থাকে। রশীদ বেশ কিছুক্ষণ সময়ক্ষেপণ করে রাষ্ট্রপতির

অপারগতার কথা জানাতে থাকেন। এভাবে অতিবাহিত হয় সময় ক্ষেপণের পালা। আমার মনে হল উভয় পক্ষই সময় নিচ্ছিল পরবর্তী পদক্ষেপ পরিকল্পনা করার জন্য। এসব অগোছালো ঘটনা প্রবাহ থেকে আমার ধারণা হল যে, এ অভ্যুত্থান নিতান্তই অপরিকল্পিত অথবা এর উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূর্ব নির্ধারণ করা হয়নি। মনে হল হঠাৎ একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের সূত্রপাত করে প্রত্যেক action এর উপর উভয় পক্ষই যার যার সুবিধামত reaction করছে। এ যেন পাইকারি বাজারে দরকষাকষি। খালেদ মোশারফের তরফ থেকে তার দেয়া শর্তগুলো নিয়ে বঙ্গভবন থেকে জেনারেল ওসমানী কথা বলতে চাইলে খালেদ মোশারফ ইতস্তত করেন। তার মতে ওসমানীর সাথে কথা বলে সময় নষ্ট তিনি করতে চাননা। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ওসমানী বিনা কারণেই পানি ঘোলাটে করবেন। কিছুক্ষণ পর রশীদ ওসমানীর সাথে কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করলে খালেদ মোশারফ ওসমানীর সাথে কথা বলেন। খালেদ মোশরফ তার শর্তের কথাগুলো ওসমানীর কাছে পুনঃব্যক্ত করে কঠোর স্বরে তাকে বলেন রশীদ, ফারুক এবং বাকী অফিসারদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে যদি সমস্ত Tank disarm করে আত্মসমর্পণ করে এবং সেনানিবাসে চলে এসে সেনাবাহিনীর Chain of command follow করে। আর চাকুরিরত অফিসার যারা তখনও বঙ্গভবনে স্বেচ্ছায় আছে তাদেরকে নিজ নিজ ইউনিটে ফিরে যেতে হবে। এসব শুনে ওসমানী কোন মন্তব্য না করে ফোন রেখে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর রশীদ টেলিফোন করে খালেদ মোশারফকে তার প্রেরিত শর্তের জবাবে জানালো যে, খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি থাকতে ইচ্ছুক নন। বঙ্গভবন ও সোহরোওয়ার্দী উদ্দ্যানে রক্ষিত ট্যাংকগুলো সেনানিবাসে ফেরৎ পাঠানো হবে তবে রশীদ, ফারুক ও অন্যান্য অফিসাররা সেনানিবাসে ইউনিটে ফিরে আসবেনা। সেনাপ্রধানকে অপসারণ করা হবে যদি তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। রশীদ এসব পাল্টা শর্ত দিয়ে শেষ কথায় জানালো যে, এসব না মানলে ৪ঠা নভেম্বর সূর্যোদয়ের পর থেকে খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেনা এবং এর প্রেক্ষিতে দেশে যে কোন পরিণতির জন্য খালেদ মোশারফই দায়ী থাকবেন। কিন্তু তখনও কেউ জানতে পারল না যে খন্দকার মোশতাক কোন আশঙ্কায় বঙ্গভবন ত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন। খন্দকার মোশতাকের হুমকির পর শুরু হল আর এক সংকট। সকাল প্রায় ৮টার দিকে বিমানবাহিনী প্রধান এম জি তওয়াব আর নৌবাহিনী প্রধান কমোডোর (পরে রিয়ার এডমিরাল) এম এইচ খান এসে দল ভারী করলেন।

এদিকে একটি লিস্ট তৈরী করা হচ্ছিল যার মধ্যে প্রায় ২২ জন অফিসারকে অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানে জড়িত অফিসারদের নাম ছাড়াও সেনাপ্রধান, বিমান বাহিনী প্রধান এবং মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানের নাম ছিল। এম জি তওয়াব লিস্টে তার নাম দেখেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না বরং সুযোগ বুঝে তিনি স্বেচ্ছায় খালেদ মোশারফ আর সাফায়াত জামিলকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া শুরু করলেন।

এর পূর্বে ভোর প্রায় ৯টার দিকে সবাইকে অবাক করে বঙ্গবভবন থেকে ডালিম এবং মেজর নুর Negotiation এর জন্য ৪ বেঙ্গলের অফিসে উপস্থিত হয়। এদের এভাবে হঠাৎ করে উপস্থিত হওয়ায় প্রথম দিকে উত্তেজনা বাড়লেও আস্তে আস্তে তা প্রশমিত হতে থাকে। এরই মধ্যে ডালিম খালেদ মোশারফের শর্তগুলো নিয়ে রশীদের সাথে টেলিফোনে আলাপ পুনরাম্ভ করল। এক পর্যায়ে ডালিম রশীদকে এখানে (সেনানিবাসে) আসতে বলল যাতে সে নিজেই খালেদ মোশারফের সাথে শর্তগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারে । রশীদ, ডালিমের কথায় রাজী হল না বরং ডালিমের সাথে বাকবিতন্ডা শুরু করল। এক পর্যায়ে ডালিম উত্তেজিত স্বরে বলল 'Do not be coward face things bravely no body is going to kill you. Here we are no body had touched us yet'. অপর প্রান্ত থেকে রশীদ, ডালিমকে উত্তেজিত হতে বারন করল এবং বলল জেনারেল ওসমানীর সাথে এসব ব্যাপারে আলাপ করার জন্য। ডালিম ওসমানীর সাথে কথা বলতে চাইলনা বরং আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। রশীদ তাকে শান্ত করার জন্য খন্দকার মোশতাকের সাথে কথা বলার জন্য ডালিমকে পীড়াপীড়ি করতে থাকাতে ডালিম দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'I do not recognise Kh. Mushtaq who is he in this matter ? I am talking to you regarding ourselves. And for you and farooq I stand committed to ensure your safety. If you decide to come here no body can touch you as long as I am alive'. এতেও রশীদ অনড় রইল। হতাশাগ্রস্ত ডালিম এবং নুর খালেদ মোশারফের তরফ থেকে আর একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বশর্তগুলো বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে সেখানে উপস্থিত সাফায়াত জামিল এবং নুরুজ্জামান খন্দকার মোশাতাককে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখার শর্তটির উপরে জোর আপত্তি জানাতে থাকলেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা হবে বলে খালেদ মোশারফ তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন।

ডালিম আর নুর এবার সামান্য সংশোধিত শর্তগুলো নিয়ে বঙ্গভবনের উদ্দেশ্য রওয়ানা হল। তাদের প্রস্থানের পরপরই ওসমানী খালেদ মোশারফের সাথে টেলিফোনে সংক্ষিপ্ত আলোপে সেনা প্রধানের নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে আরও জানালো যে খন্দকার মোশতাক will cease to be President from that morning as per earlier ultimatum. প্রতি উত্তরে খালেদ মোশারফ জিয়াউর রহমানের নিরাপত্তার ব্যাপারে ওসমানীকে আশ্বস্ত করেন এবং দৃঢ় কণ্ঠে জানান যে, তার (খালেদের) হাত তিনি কোন ভাবেই রঞ্জিত করবেন না। এ একটি বিষয়ে খালেদ মোশারফকে শুরু থেকেই সচেষ্ট থাকতে দেখেছি।

জেনারেল ওসমানী ৩রা নভেম্বর খুব ভোরে বঙ্গভবন থেকে টেলিফোন পান যার মাধ্যমে রশীদ তখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত তথ্যই তাকে দেয়। ওসমানী বঙ্গভবনের টেলিফোন পেয়েই জিয়াউর রহমানের বাসায় ফোন করলে বেডরুমের এক্সটেনশান থেকে বেগম জিয়া চাপা স্বরে ওসমানীকে জানান যে, খালেদের হুকুমে জিয়া গৃহবন্দী অবস্থায় বসার ঘরে রয়েছেন। এর বেশী বেগম জিয়া আর কিছুই বলেন নি। সেই থেকে ওসমানী জিয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদিগ্ন হয়ে উঠেন। ওসমানী কোন গাড়ী না পেয়ে কোন রকমে বঙ্গভবনে উপস্থিত হনএবং সেই থেকেই তিনি খালেদ মোশারফের সাথে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যান।

এ দিকে যতই সময় গড়াচ্ছে ততই খন্দকার মোশতাকের Ultimatum এর সময় নিকটবর্তী হওয়াতে খালেদ মোশারফ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তার ধারণা মোশতাক রাষ্ট্রপতি না থাকলে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হবে এবং পরবর্তী কোন কার্যই আইন সিদ্ধ হবে না। ডালিম আর নুর চলে যাওয়ার পর থেকেই বঙ্গভবনের খবর আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। (Bangladesh : A legacy of Blood opcit) এক পর্যায়ে ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান এবং সাফায়াত জামিল দু'জনেই মোশতাকের ultimatum শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকে গ্রেফতার করার প্রস্তাবও রাখেন কিন্তু খালেদ মোশারফ এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যেতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত বিমান বাহিনী উপ-প্রধান এয়ার কমোডোর খাদেমুল বাশারকে নিয়ে উপস্থিত হয়। খাদেমুল বাশার কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকেন। লিয়াকত তাকে তার অনিচ্ছাতেই ধরে নিয়ে আসেন। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বিমান বাহিনীর দুটো ফাইটার দিয়ে বঙ্গভবনের উপরে এবং ট্যাংকগুলোকে সতর্ক করা হবে এবং মনোস্তাত্তিক ও স্নায়ুবীক চাপ সৃষ্টি করা হবে যাতে খালেদের শর্তগুলোকে অতিসত্বর গ্রহণ করে

খন্দকার মোশতাক তার সিদ্ধান্ত জানায়। স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকতের নেতৃত্বে দুটো মিগ নিয়ে First Light এ scramble করতে হুকুম দেয়া হয়। একই সাথে দুটো Helicopter মিসাইলে সজ্জিত করে ট্যাংকগুলোকে সচেতন রাখার জন্য পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়। সমস্ত ব্যবস্থাই বিমান বাহিনী প্রধান তওয়াবের মাধ্যমেই করা হয়। এতক্ষণে ৪ বেঙ্গলের অধিনায়কের অফিসের বারান্দার সামনে রীতিমত ভীড় জমে উঠে। সেনা সদরের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিসারই ততক্ষণে উপস্থিত হয়। তারা কেন এসেছেন, কেইবা তাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছে তা বোঝা গেলনা। তাদের তৎপরতা দেখে মনে হয় যে সবাই সতস্ফূর্তভাবে এ পাল্টা অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানাতেই এসেছে এবং সবাই একটা কিছু করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকলেন। পূর্বগগণে তখন সূর্যোদয়ের রক্তিম ছটা এসে বারান্দায় পড়ছিল। নভেম্বরের সকালটা কিছুটা ঠান্ডা ভাব। রাতের সামান্য শিশির পড়ায় ঘাসের উপরে শিশিরের ফোঁটা জমা। আসে পাশে থমথমে ভাব। সবার মনে একটা উৎকণ্ঠা একটু পরেই বিমান বাহিনী শুরু করবে তাদের শক্তি প্রদর্শনী। আমি ভাবছিলাম হয়ত দেশটি নিশ্চিত একটি গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে। ভুলবশত একটি গুলী চললেই আত্মঘাতী হানাহানি শুরু হবে। এরই মধ্যে বিমানবাহিনীর দুটি মিগ আর সুসজ্জিত দুটি হেলিকপ্টার গগণ বিদার আওয়াজ করে আকাশে উড়ে বঙ্গভবনের উপর নির্দ্বিধায় লোফ্লাই করে চক্কর দিতে লাগল। ওদিকে রেডিও থেকে গত দুদিন কোন খবরেই বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় দেশের আপামর জনসাধারণ কিছুই জানতে পারছিলনা। কিন্তু ঢাকায় এ পাল্টা অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে জোর গুজব আর জল্পনা কল্পনা শুরু হল। আর এ গুজবের জের ধরল বিমানবাহিনীকে সম্পৃক্ত করাতে।

৪ই বেঙ্গল খালেদ মোশারফের হেড কোয়ার্টারে পরিণত হল। দ্রুত যোগাযোগের জন্য আরও কয়েকটি টেলিফোন সংযোগ দেয়া হল। আকাশে তখনও বিমানবাহিনীর বিমানগুলো অনবরত টহল দিয়ে যাচ্ছে। আর এরই মধ্যে ডালিম আর নুর হাজির হয়ে জানালো তারা খালেদ মোশারফের শর্ত নিয়ে বঙ্গভবনে আলোচনা করেও তেমন সন্তোষজনক কোন অগ্রগতি করতে পারেনি। তবে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ডালিম বারবার খালেদ মোশারফকে গৃহযুদ্ধ এড়াতে অনুরোধ করছিল আর বিমানবাহিনীর মিগগুলোর মিশন সমাপ্ত করার অনুরোধ জানালো। খালেদ মোশারফ তার অবস্থান থেকে অনড় রইলেন আর বারংবার ডালিমকে বললেন, 'Ball is in your court'. সময় গড়িয়ে যাচ্ছে।

বঙ্গভবন থেকে মাঝেমধ্যে কল আসছে আর তা শেষ হচ্ছিল দুপক্ষের বাকবিতন্ডতার মধ্যে দিয়ে। বেলা প্রায় ৯টা হবে। বঙ্গভবন থেকে স্বয়ং খন্দকার মোশতাক খালেদ মোশারফের সাথে অল্প সময়ের জন্য কথা বললেন। কথা শেষ হওয়ার পর খালেদ মোশারফ জানালেন যে, শক্তি প্রদর্শনী কাজে লেগেছে। মোশতাক আহমেদ শর্তগুলো মেনে নিতে রাজী হয়েছেন তার একমাত্র অনুরোধ দেশে যেন রক্তপাত না হয় সেজন্য সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যেন থাকে। আর এ রক্তপাত এড়াবার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন যে, ফারুক রশীদ আর তাদের অন্যান্য সঙ্গীরা যারা দেশ ত্যাগ করতে চাইবে তাদেরকে নির্দ্বিধায় দেশ ছেড়ে যেতে দিতে হবে। এরই সাথে সেনা প্রধান স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করছেন এ মর্মে তার (জিয়ার) লিখিত আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ করবেন। যদিও কে সেনাপ্রধান হবেন একথা খালেদ মোশারফ কখনও নিজ মুখে বলেননি কিন্তু কারও মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই ছিলনা যে, একমাত্র প্রার্থী স্বয়ং খালেদ মোশারফ। অকস্মাৎ বঙ্গভবন থেকে এ ধরনের মত পরিবর্তনের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। উপস্থিত সবাই মোশতাক আহমেদের প্রস্তাবে একটা সম্ভাব্য রক্তপাত এড়ানো গেল মনে করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। শুধুমাত্র ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন 'এদেরকে বাইরে যেতে দেয়া যেতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর হত্যার জন্য এদেরকে দায়ী করে বিচার করা হোক।' কিন্তু তার কথার খুব একটা গুরুত্ব কেউই দিলনা। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর খন্দকার মোশতাকের প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সে অনুযায়ী বঙ্গভবনকেও জানিয়ে দেয়া হল আর বিমান বাহিনী প্রধানকে দায়িত্ব দেয়া হল ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানে জড়িত সকল অফিসারকে পরিবার সমেত Safe conduct and safe passage assure করে আজকে ৩রা নভেম্বর বিকেলের মধ্যে তাদের পছন্দসই দেশে পাঠানো হোক যদি সেদেশ তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে সম্মত হয়। আর বিমানবাহিনী প্রধানকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হলে তিনি তক্ষণি তার হেডকোয়ার্টারের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। খালেদ মোশারফ টেলিফোনে সকল ব্রিগেড কমান্ডারগণকে সার্বিক পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। এতক্ষণ পর্যন্ত ডালিম আর নুর ৪র্থ বেঙ্গলই ছিল এ সিদ্ধান্তে গ্রহণের পরপরই তারা বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারপর ডালিমও নুরকে আর দেখা যায়নি।

খালেদ মোশারফ সফল অভ্যুত্থানের নেতা হওয়াতে তার সমর্থকদেরও অভাব রইলনা। প্রায় সব সিনিয়র অফিসার খালেদ মোশারফকে সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের সমর্থনের নিশ্চয়তা দিতে লাগলেন। এত সবের মধ্যেও সাফায়াত জামিলকে সেনা প্রধানের (জিয়াউর রহমানের) নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকতে দেখা গেল।

হঠাৎ দৃশ্যপটে কেন পরিবর্তন হল? কেনইবা যুদ্ধং দেহী ফারুক আর রশিদের এ মত পরিবর্তন। সেদিন সেনানিবাসে বসে কেউই জানতে পারলো না এ মত পরিবর্তনের পেছনে ছিল জেলে আওয়ামী লীগের চারজন সিনিয়র নেতার হত্যা। আর এ হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয় রশীদ আর খন্দকার মোশতাকের সজ্ঞানে এবং সম্মতিতে। ৩রা নভেম্বর সকালেই পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এ হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের নেতৃত্বে। উল্লেখ্য, এই রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ১৫ই আগস্ট, অভ্যুত্থানে শেখ মনির বাড়ীতে হামলা চালিয়া তাকে হত্যা করে বলে জানা যায়। এ জঘন্য ঘটনায় আওয়ামী লীগের যে চার নেতা প্রাণ হারান তাঁরা হলেন ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান আর তাজউদ্দিন আহমেদ। এঁদেরকে আগস্টের শেষের দিকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। এ ঘটনা খন্দকার মোশতাক আর রশীদ ছাড়াও ৩রা নভেম্বর সকালে যে আর একজন ব্যক্তি জেনে ছিলেন তিনি হলেন মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান। মেজর জেনারেল খলিলকে সংবাদটি দেয় আইজি পুলিশ এবং সাথে সাথেই খলিলুর রহমান রাষ্ট্রপতির সচিব মাহবুবুল আলম চাষীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে জানাতে বলেন। মাহবুবুল আলম চাষী সংবাদটি মোশতাক আহ-মেদকে দিতেই রাষ্ট্রপতির অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারেন যে এ হত্যা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকেবহাল। রশীদ যখন বুঝতে পারল যে এ ঘটনা আর বেশীক্ষণ চাপা থাকবেনা এবং পূর্বের Indemnity Ordinance এর আওতায় এটা পড়বেনা তখনই আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা তাকে গ্রাস করে এবং পূর্বের অনড় সিদ্ধান্ত বজায় রাখার সাহস আর রইলনা। সে বুঝতে পারে যে, এ ঘটনা প্রকাশ পেলেই একদিকে জনতার বিরাগভাজন হওয়া আর অন্যদিকে খালেদ মোশারফের রোষানলে তাদেরকে পড়তে হবে। কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক সময় অপচয় না করে আপাতত দেশের বাইরে চলে যাওয়াই শ্রেয়। আর ঠিক তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য অত্যন্ত তুরতার সাথে খন্দকার মোশতাককে দিয়ে

খালেদ মোশারফের নিকট থেকে সম্মতি আদায় করা হয়। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান কোন অজ্ঞাত কারণে ঘটনাটি চেপে যান এবং তিনি অন্য কাউকে এ বিষয়ে জানতে দেননি এমনকি সেনানিবাসেও কাউকে জানতে দেননি। আর এ ঘটনা যখন খালেদ মোশারফ এবং সাফায়াত জামিল জানতে পারলেন তখন রশীদ, ফারুক, ডালিম ও মোসলেম দেশের বাইরে, ব্যাংককে। [১]

৩রা নভেম্বর মধ্যে রাতের পরেই যখন খালেদ মোশারফের পাল্টা অভ্যুত্থানের খবর বঙ্গভবনে পৌঁছে তখন থেকেই সেখানে অবস্থানরত ল্যান্সার সৈনিকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সমগ্র বঙ্গভবনে ছড়িয়ে পড়ে এক অজানা আশঙ্কা। এ উত্তেজনা আর আশঙ্কার মধ্যেই ভোর ৪টার দিকে ডিআইজি প্রিজনের তরফ থেকে একটি ফোন আসে যা রশীদ রিসিভ করলে রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলার জন্য। ডিআইজি প্রিজন অনুরোধ জানালে রশীদ ফোনটি রাষ্ট্রপতিকে দেন। রাষ্ট্রপতি টেলিফোন ধরে তাড়াতাড়ি তার সম্মতি জানিয়ে তরিঘড়ি করে ফোনটি রেখে দেন। ফোনে ডিআইজি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে তার গেটে উপস্থিত রিসালদার মোসলেমের নেতৃত্বে সুসজ্জিত কয়েকজন সৈনিককে সশস্ত্র অবস্থায় জেলের ভেতরে প্রবেশাধিকার দেন। কিন্তু তখনও ডিআইজি প্রিজন সশস্ত্র অবস্থায় এই সৈনিকদলের জেলে আগমনের হেতু জানতেন না। মোসলেমউদ্দিন জেলের ভেতরে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকে তার কাছে হস্তান্তর করার দাবী জানায়। এবার আরেকবার ডিআইজি প্রিজন অসম্মতি জানালে মোসলেম জানায় তার জেলে আসার কার্যক্রমের সম্মতি বঙ্গভবনে অবস্থানরত রশীদ ও রাষ্ট্রপতির রয়েছে। ডিআইজি মোসলেমের এ দাবীতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে আর একবার বঙ্গভবন যোগাযোগ করলে এবার রশীদ তাকে মোসলেমের কথামত কাজ করতে বলেন কিন্তু ডিআইজি রশীদের কথায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে প্রেসিডেন্টের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে রশীদ আরেকবার ফোন খন্দকার মোশতাকের হাতে তুলে দেয়। এবারও খন্দকার মোশতাক ডিআইজিকে মোসলেমের কথানুসারে কাজ করতে বলে টেলিফোন রেখে দেন। অগত্যা ডিআইজি মোসলেমের কথামত সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান, তাজউদ্দিনের সেলে নিয়ে আসে। মোসলেম চারজনকে এক লাইনে দাঁড় করে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে নির্দয়ভাবে জেলে রাজবন্দী থাকা

---

১. "*Bangladeh : A degacy of Blood*" Ibid.

অবস্থায় হত্যা করে। এভাবেই দেশের সর্বোচ্চ অফিসের সম্মতিতেই পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক সংগঠিত হয় বাংলাদেশের ইতিহাসের জঘন্যতম কাপুরুষোচিত হত্যা, যা বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ইতিহাসকেও কলঙ্কিত করে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিণতি এই রিসালদার মোসলেম এর দু'বছর পরে নিহত হয় বলে শোনা যায় জিয়ার বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকালে। এ হত্যার বিবরণ জানা যায় ৪ঠা নভেম্বরে গঠিত তদন্তের টেপে ধারণকৃত জবানবন্দী থেকে। আর এ সামরিক তদন্তের ভার দেয়া হয়েছিল লেঃ কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) এ জে এম আমিনুল হককে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণ আজ পর্যন্ত জন সম্মুখে আসেনি। তবে এ হত্যা পূর্বপরিকল্পিত ছিল এ তথ্য অস্বীকার করেন রশীদ এবং তার সাথের অন্যান্য অফিসাররা। ১

এদিকে ৩রা নভেম্বর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এম জি তওয়াব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বহুদেশেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন যাতে দেশ ত্যাগকারী অফিসারদের Political Assylum দিতে যদি কোন দেশকে সম্মত করানো যায়। এদিকে খালেদ মোশারফের সামনে বসে থাকা নুরুজ্জামান নানা রকমের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এক পর্যায়ে তিনি এও বলেন যে, এরা যাতে বিদেশে যাওয়ার নাম করে দেশের মধ্যেই কোথাও নামতে না পারে। তার আশঙ্কা ছিল এসব অফিসাররা প্লেনটিকে হাইজ্যাক করে যাশোরে নামাতে পারে। যশোরে তখন ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী। অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত হয় যেমন করেই হোক বিমানের 'ফোকার' এয়ারক্রাফট ব্যবহার করে সন্ধ্যার পরই দেশ ত্যাগ করাতে হবে। আর এ ব্যবস্থা নেয়া হয় যাতে এ বিমান দেশের অভ্যন্তরে আর কোন বিমান বন্দরে নামতে না পারে। সে সময়ে একমাত্র চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ছাড়া আর কোন বিমান বন্দরেই নাইট ল্যান্ডিং এর ব্যবস্থা ছিল না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো। আমরা দুপুরে ৪ বেঙ্গলের লাইনেই খাবার সেরে বসে রইলাম। খালেদ মোশারফ আর সাফায়াত জামিল দুপুরের দিকে নিজ নিজ বাসভবনে গিয়ে বিকেলেই চলে আসলেন। তবে এর আগেই খালেদ মোশারফ তিনজন অফিসারকে জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ পত্র আনার জন্য তার বাসভবনে পাঠালে তিনি কোন ওজর আপত্তি না করে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করেন। তবে তিনি একটি অনুরোধ করে পাঠান যাতে তাকে পূর্ণ পেনশন সুবিধাদি দেয়া হয়। তার এ অনুরোধে অনেকেই বিস্মিত

---

১. *Bangladesh : A Legacy of Blood*. Ibid.

হলেন এই বলে যে, একজন সেনাপ্রধান এ সময়ে এ ধরনের অনুরোধ কিভাবে করতে পারেন। একথা নেহায়েৎই সত্য যে, সেদিন থেকেই যদি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অবসর জীবন কাটাতে হত তবে তার মত একজন সৎ অফিসারের পক্ষে কোন কিছু না করে ঐ সামান্য পেনশনে পরিবার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হত। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এবং মৃত্যুর পরও তাঁর পরিবারকে সরকারী অনুদান ও রাষ্ট্রপতির অন্যান্য সুবিধাদি দেয়াতেই তাঁর পরিবার স্বচ্ছলতা পেয়েছে। এ ধরনের সততা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষেত্রে বিরল দৃষ্টান্ত স্বরূপ থেকে যাবে।

জিয়াউর রহমানের পদত্যাগপত্র প্রদানে খালেদ মোশারফের সেনা প্রধান হওয়ার পথে আর কোন বাধাই রইল না কারণ সে সময় সবাই তাকেই একরকম সেনাপ্রধান হিসেবেই গণ্য করতে শুরু করলেন। এবং তাকেই যে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে দেশকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে হবে এ ধরনের প্রোপোজাল বিমানবাহিনী প্রধান এমজি তওয়াব আর নৌবাহিনী প্রধান এমএইচ খানের তরফ থেকেই আসে।

৩রা নভেম্বর বিকেলের দিকেই জানা গেল বাংলাদেশ বিমানের একটি ফোকারে করে ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানে অফিসার ও তাদের পরিবারদের সন্ধ্যার দিকে প্রথম পর্যায়ে ব্যাংককে পৌছেয়ে বিমান ফিরে আসবে। থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে তাদেরকে পরে গ্রহণযোগ্য দেশে পাঠানো হবে। সেদিন যারা বিমানবন্দরে ছিলেন তাদের বিবরণ থেকে জানা যায় প্রায় সতের জন অফিসার ও তাদের পরিবার উপস্থিত হয়ে দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। অনেকেই সেখানে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বিশেষ করে পরিবারের অন্য সদস্যগণ। আরও জানা যায় ডালিমের পত্নী দেশ ছাড়তেই চায়নি পরে সে ডালিমের অনেক কথার পর তার সাথে যেতে সম্মত হয়। বিমান প্রায় আধা ঘন্টা দেরীতে ছাড়ে। বঙ্গভবন ছাড়ার সময় ফারুকের অনুগত বেঙ্গল ল্যান্সারের সদস্যবৃন্দ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কান্নায় এবং নিজেদের ভবিষ্যতের সংকায় মনস্তাত্তিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২ ফিল্ড আর্টিলারী ইউনিটটি ১৫ই আগস্টের পরপরই সেনানিবাসে চলে আসায় তাদের উপরে পরবর্তীতে কোন চাপ আসেনি। তবুও একটা অজানা আসঙ্কায় তাদেরকেও স্নায়ু চাপের মধ্যে থাকতে হয়। রশীদ ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট ছাড়ার পরই লেঃ কর্নেল আনওয়ার হোসেন (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) ঐ

ইউনিটের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ৩রা নভেম্বর সকালেই আমি ২ ফিল্ড রেজিমেন্টে গেলে সমগ্র ইউনিটকে ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থায় দেখি। স্বাভাবতই তাদের ভয় ছিল পদাতিক বাহিনীর প্রতিহামলা বা কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। তাদেরকে অনেক আশ্বস্ত করে আমিও ইউনিট অধিনায়ক পৌছার পর ব্রিগেড কমান্ডারকে ঐ ইউনিটের মনোবলের কথা জানালে তিনি অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আনোয়ার হোসেনকে ডেকে আশ্বস্ত করেন। একমাত্র রশীদ ছাড়া ২ ফিল্ড রেজিমেন্টের আর কোন অফিসারই দেশ ত্যাগকারীদের দলে ছিলনা। ঐ দিনই সন্ধ্যা প্রায় ৭টার দিকে বাংলাদেশ বিমান ফোকার ফ্লাইটটি ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত অফিসার ও তাদের পরিবারদের নিয়ে দেশ ত্যাগ করে যার মধ্যে রিসালদার সোমলেমও ছিল। তাদের দেশ ত্যাগের সাথে সাথে আপাত দৃষ্টিতে অবসান হয় ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের পর থেকে অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের বঙ্গভবন দখল। কিন্তু তখনও কেউ জানলনা যে ঢাকা জেলে ঘটে গেছে এক জঘন্য হত্যাকান্ড।

ফারুক, রশীদের দেশত্যাগের পর বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাক আর তার মন্ত্রী পরিষদ রয়ে গেল অসহায়ের মত। সেদিন বিকেলের দিকেই বঙ্গভবনে আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে অবস্থানরত ট্যাংকগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হল।

বিমান ঢাকা ত্যাগ করার পর খালেদ মোশারফ আর সাফায়াত জামিল অফিস থেকে বের হয়ে গেলেন। সারাদিনের ধকলে আর মানসিক চাপে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম। মেজর হাফিজ সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় সংযোগ রক্ষা করে কিছুক্ষণের জন্য অফিসে এসে আবার বের হয়ে গেল। সেদিনও খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতির পদে বহাল থাকা সত্ত্বেও কার্যত দেশে কোন সরকার ছিল বলে মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল সেনানিবাসের ভেতরেই চলছিল দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ আর গুটি কয়েকজন সামরিক অফিসারের হাতেই এখন দেশের চাবিকাঠি। আমি ভাবতে লাগলাম যে, পুরো একটি দিনে এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকগণ কিছুই জানতে পারলনা আর তারা এ পাল্টা অভ্যুত্থানকে কিভাবে গ্রহণ করবে বা করছে এখবর নেয়ার মাথাব্যথা মনে হল কারোই ছিল না। এসব ভাববার কারণ হল ফারুক, রশীদ অন্যরা ১৫ই আগস্টের পর দেশে যে পরিবর্তন এনেছে সে পরিবর্তনে তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়েছে আর স্বভাবতই এ পাল্টা অভ্যুত্থান তার বিপরীত মেরুতে দেখা হবে। কার্যত হয়েছেও তাই।

সেনানিবাসে ৩রা নভেম্বর থেকে গুজবের সূত্রপাত হয় যে, এ অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগের অনুকূলে করা হয়েছে কিন্তু তখন এসব গুজব বন্ধ করার জন্য সিনিয়র অফিসাররা কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেন নি। এক কথায় ১৫ই আগস্টের পরিবর্তনকে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীর সিংহভাগ সদস্যই মনে প্রাণে গ্রহণ করে বিশেষ করে যখন ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করা হয়। আর আগস্ট অভ্যুত্থানকে দেখা হয় Anti Indian পদক্ষেপ হিসেবে। উল্লেখ্য সশস্ত্রবাহিনীতে তৎকালীন ক্ষমতাশীন দলকে Pro-Indian বলে মনে করা হত। সে ক্ষেত্রে এ পাল্টা অভ্যুথান স্বভাবতই এবং এর উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক সন্দেহের জন্ম দেয়। আরও বিশেষ কারণ হল এ পাল্টা অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য কখনও কোনভাবে জনগণের নিকট তুলে ধরা হয়নি। আর ঢাকার বাইরের সেনানিবাসগুলো সঠিক পরিস্থিতিও জানতে পারছিল না। ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যায় পর থেকে শোনা যাচ্ছিল যে, আওয়ামী লীগের কর্মীরা এ অভ্যুত্থানকে তাদের স্বপক্ষের বলে প্রচারণা শুরু করেছে এবং পরের দিন সকালে, ৪ নভেম্বরে এ অভ্যুত্থানের স্বপক্ষে মিছিল ও সভা সমিতির আয়োজন করা হয়েছে। কার্যত করেছিলও তাই। যদিও এসব গুজবের সাথে বিশেষ করে অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে যে গুজব বের হচ্ছিল তার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্কই ছিল না। খালেদ মোশারফ বা সাফায়াত জামিল বা সেখানে উপস্থিত কোন অফিসারই সমস্ত দিনে এমন ধরনের কোন ধারণাই কোন পর্যায়ে দেননি যার প্রেক্ষিতে এসব গুজব ছড়াতে পারে। তাই যদি হত তবে জেলহত্যার পরপরই সে সংবাদ তাদের কাছে পৌছাত বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে এটা সত্য যে, খালেদ মোশারফের মাতা ছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মী আর তার ভাই রাশেদ মোশারফ ছিলেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য। সে কারণেই খালেদ মোশারফ আর আওয়ামী লীগ ঘিরে এ গুজবের উৎপত্তি। আরও গুজব শোনা যায় যে, এ অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতের ইঙ্গিত রয়েছে। এ ধারণা বা এরূপ গুজবের না ছিল কোন ভিত্তি না ছিল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক। এ ব্যাপারে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রাখি। আজও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি খালেদ মোশারফ, সাফায়াত জামিল এবং অন্যান্য যারা এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের কারও সাথে তৎকালীন আওয়ামী লীগের কোন নেতৃবৃন্দের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর ভারতের সাথে যোগসাজস থাকার ধারণা অমূলক। খালেদ মোশারফ, সাফায়াত জামিল ও অন্যান্যরা যে ধরনের দেশপ্রেমিক ও যুদ্ধে তাদের যে অবদান রয়েছে

সেখানে এদের সম্বন্ধে এধরনের ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত Unjustified. হয়ত কিছু কাকতালীয় ঘটনা সে সময়ে ঘটতে পারে। এর একটির ব্যাপারে পরে আলোচনা করব।

৩রা নভেম্বর রাত প্রায় ১০টা। সাফায়াত জামিল ৪ বেঙ্গল অফিসে আসলেন। তাকে খুব ক্লান্ত মনে হল। নতুন সেনাপ্রধানের নিয়োগের কোন খবরই তখনও পাওয়া যায় নি। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি পরের দিন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানালেন। কমান্ডারকে একা পেয়ে আমি গুজবের কথাগুলো জানালাম আর সাথে আমার অনুভূতিগুলোও জানালাম। স্পষ্টভাবেই বলেছিলাম, যেহেতু এ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বাইরে কেউই কিছু জানছে না তাই নানা রকমের গুজব ছাড়াচ্ছে আর তাদেরকে নিয়েও আওয়ামী লীগ আর ভারতকে জড়িয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বিশেষ কিছু না বলে আবার বের হয়ে গেলেন। তিনি বের হবার আগে বিমানবাহিনীর প্রধান এসে খবর দিলেন যে, বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটটি ব্যাংককে পৌঁছে গেছে।

সে রাতে ইউনিট লাইনেই থেকে সকালে বাসায় গিয়ে একবারে তৈরী হয়ে পুনরায় ফিরে এলাম ৪ বেঙ্গল অফিসে। অল্প কিছুক্ষণের ব্যবধানে সাফায়াত জামিলও এসে পৌঁছলেন। আস্তে আস্তে আগের দিনের মতই অন্যান্য অফিসারদের ভীড় জমতে থাকল। আমি ব্রিগেড অফিসে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়ার সময়েই জানতে পারলাম রংপুর থেকে লেঃ কর্নেল নওয়াজীশের অধিনায়কত্বে ১০ই বেঙ্গল আরিচায় পৌঁছে গেছে। লেঃ কর্নেল নওয়াজীশ পরে কর্নেল এবং চট্টগ্রামে ১৯৮১ সনের অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার দায়ে তার ফাঁসী হয়। লেঃ কর্নেল জাফর ইমামের (পরে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি থেকে মন্ত্রী) ১৫ই বেঙ্গল যমুনা নদীর অপর পারে ঢাকায় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। রংপুর থেকে এ পদাতিক ইউনিটের ঢাকা আগমনে এ ব্যাপারে আমার পূর্বের কোন তথ্য জানা ছিলনা। সাফায়াত জামিলকে ব্যাপারটা বোধ করি ফোনে জানাই। তিনিও কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বলেন How could they come so fast ? এখন মাত্র ৪ নভেম্বর সকাল। মনে হল তিনিও এ ব্যাপারে বিশদ কিছু জানতেন না। কেনইবা এরা এখানে এল, কেই বা এ দুই ইউনিটকে আসতে হুকুম দিয়েছিল কিছুই জানা ছিল না। প্রসঙ্গত ১০ই বেঙ্গল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে খালেদ মোশারফের সেক্টরেই পুনর্গঠিত হয়ে যুদ্ধ করে। ১০ এবং ১৫ই বেঙ্গল এ দুই ইউনিটই রংপুরে ৭২

ব্রিগেডের অধীনে ছিল আর এ ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল কে এন হুদা। কে এন হুদা খালেদ মোশারফের প্রিয়ভাজনও আত্মীয় ছিলেন। কর্নেল কে এন হুদা প্রাথমিক ভাবে সাপ্লাই কোরের অফিসার ছিলেন যার নাম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে জড়িত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন। সাফায়াত জামিল টেলিফোন ছাড়ার আগে আমাকে বললেন, স্টেশন হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে১০ই বেঙ্গলের জন্য বাসস্থান ও রেশনের বন্দোবস্ত করতে। আমি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকেই এ কাজ সমাধান করলাম। আপাতত সাব্যস্ত হল শেরেবাংলা নগরের এম পি হোস্টেলে থাকবে এবং অন্যান্য সুবিধাদির জন্য স্টেশন হেডকোয়ার্টারের সাথে সংযুক্ত থাকবে। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার ছাড়ার আগ মুহূর্তে সেনাভবন (এখন খালেদা জিয়ার বাসভবন) থেকে ক্যাপটেন জিল্লুর রহমান (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) জিয়াউর রহমানের এডিসি, জানালেন সেনাপ্রধানের গাড়ী ফেরৎ নেয়া হয়েছে। ফলে দৈনন্দিন কাজের অসুবিধে হচ্ছে। পারিবারিক কেনাকাটাও সম্ভব হচ্ছে না। এটা নিতান্তই লজ্জাজনক ব্যাপার কিন্তু আমার মনে হল কেউই এধরনের আদেশ নির্দেশ দিতে পারেনা। হয়ত নিচের স্তরের কোন ব্যক্তির বাড়াবাড়িও হতে পারে। এ ধরনের ব্যাপার সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

আমি কাউকেই জিজ্ঞেস করার জন্য পাচ্ছিলাম না বলে গাড়ীখানা খুঁজে জিল্লুরকে জানালাম সর্বক্ষণের জন্য সেনাপ্রধানের সমস্ত প্রশাসন কাজ আগের মতই চলবে। দরকার হলে বা অন্য কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে আমাকে জানাতে। হয়ত পরে আর কোন সমস্যা হয়নি বলে আমার সাথে জিল্লুরের ৭ই নভেম্বরের সকাল পর্যন্ত আর যোগাযোগ হয় নি।

ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে কাজ সেরে ৪ বেঙ্গলে ফিরে শুনলাম কমান্ডার আমাকে খুঁজছিলেন এবং পরে হাফিজের সাথে বঙ্গভবনের দিকে চলে গেছেন। তখন সময় প্রায় দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। ৪ বেঙ্গলের অধিনায়কের অফিসে থাকতেই শুনলাম কর্নেল সবিহউদ্দিন টেলিফোনে সেনানিবাসের মেইন গেটে এমপির (মিলিটারি পুলিশ) সাথে কথা বলছেন। পরে জানতে পালাম Indian Highcommission এর Defence Attache ব্রিগেডিয়ার ভোরা, খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলেন। যেহেতু এ সাক্ষাৎকারের কোন পূর্ব অনুমতি ছিলনা তাই এমপিরা তাকে ঢুকতে দেয় নি। তাকে ফিরে যেতে বলা হল। তবে মেইন গেট থেকে ফিরে যাবার আগে তিনি খালেদ

মোশারফের জন্য একটা প্যাকেট শুভেচ্ছা স্বরূপ রেখে গেলেন যা পরে সরাসরি সেনাসদরে খালেদ মোশারফের অফিসে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, সে প্যাকেটে কি ছিল তা দেখার সময় তিনি পাননি। ভোরার আগমন এবং এ সংকটময় মুহূর্তে খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করার কারণ কেউই জানতে পারলা না কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে এ ঘটনা খালেদ মোশারফের Pro - Indian হওয়ার গুজবে আরও ইন্ধন যোগায়। ভোরার আগমন কি সম্পূর্ণ কাকতালীয় বা ইচ্ছে করেই সেদিন ব্রিগেডিয়ার ভোরা খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন তা কেউই জানতে চাইলো না।

৪ঠা নভেম্বর সকালেই আমি আবার ৪ ইস্ট বেঙ্গলে পৌছলাম। তখনও যেখানে গুটি কয়েক জুনিয়র অফিসার ছাড়া আর কেও পৌছেনি। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কমান্ডার ৪৬ ব্রিগেডের অপেক্ষায় অনেকেই সেখানে জড় হয়েছে। গত রাতে ১৫ই আগস্টের হোতারা দেশ ছাড়বার পরের পদক্ষেপ জানার আগ্রহ সকলেরই । প্রায় ৯টার দিকে সাফায়াত জামিল এসে পৌছলেন । তিনিও খালেদ মোশারফের অপেক্ষায় পায়চারি করছেন। আরও পরে খালেদ তৎকালিন এন এস আই চীফ ই এ চৌধুরীকে নিয়ে ৪র্থ বেঙ্গলের অধিনায়কের রুমে প্রবেশ করে। উপস্থিত সিনিয়র অফিসারদের নিকট প্রথমবারের মত এ ই চৌধুরীর মুখে শোনা গতরাতের নারকীয় জেল হত্যার কথা শুনলেন। এ সংবাদ বোমা বিস্ফোরণের মত সকলকে হতবাক করে দিল। প্রায় ২৪ ঘন্টার উপরে হয়ে যাওয়া খবর শুনে সাফায়াত জামিল উন্মাদও উত্তেজিত হয়ে খালেদ মোশারফকে অন্যান্য চীফ সহকারে বঙ্গবভনে গিয়ে এর প্রকৃত ঘটনা এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জোরালো অনুরোধ জানালে প্রায় ১১টার দিকে খালেদ মোশরফ ই এ চৌধুরীকে নিয়ে বঙ্গবভনে চলে যান। প্রায় সমস্ত দিন গড়িয়ে গেল কিন্তু বঙ্গভবন থেকে কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। সময় যতই গড়াতে লাগল সেনানিবাসে উৎকণ্ঠা ততই বাড়তে লাগল।

আমি দুপুরে এক ফাঁকে বাসায় গিয়ে মধ্যন্য ভোজ শেষ করে বিকেলের দিকে ৪র্থ বেঙ্গলে এসে কমান্ডারের খোঁজ করে জানতে পারলাম তিনি অন্যান্য অফিসারদের চাপে পড়ে নিজেই বঙ্গভবনের ঘটনা জানার জন্য সেখানে চলে গেছেন এবং তার সাথে নিজস্ব অফিসার না থাকায় আমাকে বঙ্গভবনে যেতে নির্দেশ রেখে যান। আমি কোন রকমে একটি জীপ জোগাড় করে সন্ধ্যার অনেক পরে বঙ্গভবনে পৌঁছি।

বঙ্গভবনে এর পূর্বেও আমি বহুবার গিয়েছি কিন্তু সেদিনকার পরিস্থিতি ভুলবার নয়। কেবিনেট হলের সামনে কেমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি । উপস্থিত সবাইকে কেমন যেন আতঙ্কিত মনে হল। চারদিকে দেখে মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে এখানে রিতিমত ছোটখাট যুদ্ধ হয়ে গেছে। কড়িডোর রক্ষিত একটি সোফায় মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান বসে ঘামছেন । চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আর তার বামে বর্মা জেনারেল ওসমানী নিশ্চুপ নির্বিকার। আমি কড়িডোরে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও ওবায়দুর রহমান একত্রে সশস্ত্র প্রহরায় বেরিয়ে যাচ্ছে। জানতে পারলাম তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হচ্ছে। কমান্ডারকে খোঁজবার চেষ্টা করলাম। তাকে না পেয়ে আমি কেবিনেট হলের পাশে এডিসিদের কামরায় গিয়ে বসলাম। সেখানে বসে বোধহয় সেনা এডিসির কাছ থেকেই সেসময়কার বিবরণ শুনলাম। তাতে আমার হৃদ স্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ৩রা নভেম্বরের জেলহত্যার খবর পেয়ে ইএ চৌধুরীর এবং খালেদ মোশরফ বঙ্গভবনে দুপুরের দিকেই আসেন এবং তাদের সাথে যোগ দেন আরও দুই বাহিনী প্রধানগণ। প্রায় সমস্ত দিনই তাঁরা সেখানে কাটান। কার্যত খালেদ মোশারফ অপেক্ষা করছিলে নতুন সেনাপ্রধানের কেবিনেট অনুমোদনের জন্য।

সন্ধ্যার পর পর সাফায়াত জামিল এসে বঙ্গভবনে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। প্রথমে সাফায়াত জামিল খালেদ মোশারফ এবং অন্যদের নির্বিকার বসে কেবিটে মিটিং শেষ হবার অপেক্ষারত থাকায় তিনি রাগে ফেটে পরেন এবং কিছুটা উচ্চস্বরে খালেদ মোশারফের সাথে বাকবিতণ্ডতায় লিপ্ত হয়ে জানান, সে মোশতাক কেবিনেট মিটিং এর নামে সময় ক্ষেপণ করছেন আর ও দিকে সেনানিবাসে বিভিন্ন রকম গুজব ও জুনিয়রদের মধ্যে উত্তজনা বেড়ে চলেছে। যেহেতু সাফায়াত জামিলই ছিলেন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার এবং অফিসার ও জওয়ানদের সাথে সংস্পৃক্ত কাজেই তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং ক্রমাগত চাপের মুখে পড়েন আর খালেদ মোশারফের বিরুদ্ধে আর একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের গুজবের খবরটিই জানতে পেরে নিজেই খালেদের কাছে চলে এসেছিলেন।

সাফায়াত জামিল কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন কারণ কার্যত জিয়াউর রহমানের অবসর গ্রহণের পর সেনাপ্রধান হিসেবে কেউই দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি এবং খালেদ মোশারফ একজন জুনিয়র ব্রিগেডিয়ার হওয়াতে যতক্ষণ

পর্যন্ত র‍্যাংকে উন্নীত না হচ্ছেন তার কোন আদেশই সেনা Chain of Command এ বৈধতার ছাপ থাকবে না। ওদিকে জেল হত্যার খবর পেয়েও কেন কেবিনেট মিটিং চলতে দেখা হচ্ছে তারও ব্যাখ্যা সাফায়াত জামিল জানতে চাইলেন। এসব বাকবিতন্ডতা আর হৈ চৈ এর মধ্যে হঠাৎ খন্দকার মোশতাক এবং ই এ চৌধুরী কেবিনেট হল থেকে বের হয়ে দরজার সামনে এসে খন্দকার মোশতাক উচ্চস্বরে বলে উঠেন যে তিনি কোন প্রেসারে কিছুই করবেন না এবং অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই কারণ তিনি বহুবার বহু পাকিস্তানী জেনারেলদের ধমককেও পাতা দেন নাই। কাজেই বাংলাদেশের এসব কর্নেল এবং ব্রিগেডিয়ারদের কথায় তিনি বিচলিত নন। এসব উত্তেজক কথাবার্তার মধ্যেই এর Reaction এ বঙ্গভবন পাহাড়ায় নিয়োগ কৃত ১ম বেঙ্গলের কোম্পানী অধিনায়ক মেজর ইকবাল তার সয়ংক্রিয় অস্ত্র খানি খন্দকার মোশতাকের দিকে তাক করে বলে উঠে " You have seen many Pakistani General but you have not seen many Bangladeshi Majors" এতে মোশতাক হকবকিয়ে যায় এবং পাশে দন্ডায়মান জেনারেল ওসমানী সাফায়াত জামিলকে মেজর ইকবালকে নিবৃত করতে বলেন, " For heaven sake do something let Burma incidence not be repeated here in Bangabhaban" প্রসঙ্গত বার্মায় জেনারেল নেউইনের অভ্যুত্থানের সময় Presidential Palace একই ধরনের পরিস্থিতিতে রক্তপাত হয়।

ওসমানীর উৎকন্ঠা আর বেহাল অবস্থা দেখে সাফায়াত জামিল দ্রুত ইকবালের এবং খন্দকার মোশতাকের মধ্যে এসে দাড়িয়ে ইকবালকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে জেনারেল খলিল কিছু বলতে গেলে তিনি তাঁকে ধমকদিয়ে সরিয়ে দেন আর খোন্দকার মোশতাক দ্রুত কেবিনেট রুমে চলে যান। মোশতাকের ভাষ্যমতে তিনি এ জেল হত্যার সম্বন্ধে আজই এই দিনই মানে ৪ঠা নভেম্বর প্রথম জানলেন বলে ধারণা দেন আরও বলেন এ বিষয়ের উপর তিনি একটি জুডিশিয়ারী তদন্তের হুকুম দিয়েছেন।

৩রা নভেম্বর সকালের জেলহত্যার খবর আজ বিকেলে (৪ঠা নভেম্বর) কেবিনেট মিটিং চলাকালে জানা গেছে। বস্তুত এ হত্যা ফারুক, রশীদরা দেশে থাকতেই হয়েছে কিন্তু ঘটনা চেপে রাখা হয়েছে যাতে তারা নিরাপদে দেশের বাইরে যেতে পারে। এ খবর জেনারেল খলিল জানতেন কিন্তু কেন যে তিনি একথা কাউকে জানালেন না এটা অত্যন্ত রহস্যজনক। এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই

আমি আলোচনা করেছি। খলিলের এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা নিয়ে খালেদ মোশারফ, সাফায়াত জামিল আর তার মধ্যে প্রচন্ড বাকবিতন্ড এবং উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় আর এ বিষয় নিয়ে সমস্ত বঙ্গভবনে তোলপাড় হয়। সাফায়াত জামিল উত্তপ্ত অবস্থায় খলিলুর রহমানকে বঙ্গভবন ত্যাগ করতে মানা করেন। লেঃ কর্নেল এ জেএম আমিনুল হককে নতুন সেনাপ্রধানের তরফ থেকে জেল হত্যার উপরে সামরিক এনকোয়ারীর জন্য নিয়োগ করা হয় এবং তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞসাবাদ করে টেপে ধারণ করেছেন। তিনি ছাড়াও আরও একজন বিচারককে নিয়োগ করা হয়েছিল জুডিসিয়াল এনকোয়ারীর জন্য। আরও জানতে পারলাম কেবিনেট মিটিংএ খালেদ মোশারফের পদোন্নতি অনু-মোদন দেয়া হয়।

সেদিন বঙ্গভবনে কেবিনেট মিটিং চলাকালে যা ঘটেছিল তা হয়ত বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা হয়ে থাকবে। যখন খালেদ মোশারফের পদোন্নতি নিয়ে আলোচনা এবং অনুমোদন দেয়া হয় ঠিক সে সময়েই এনএস আই এর চীফ কেবিনেট রুমেই খন্দকার মোশতাককে জেলহত্যার ঘটনা জানালেন, তাও ২৪ ঘন্টার বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর। খবর শুনে খন্দকার মোশতাক হতবাক হবার অভিনয় করতে থাকেন এবং এ চারনেতার এ ধরনের মৃত্যুর জন্য কপট ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাফায়াত জামিলও খবর শুনে স্থির থাকতে পারলেন না বিশেষ করে যখন এতবড় একটা ঘটনা সবাই চেপে গিয়েছিলেন। সাফায়াত জামিল এমনিতেই খন্দকার মোশতাককে অশ্রদ্ধা করতেন তার উপর এ ধরনের হটকারিতা সহ্য করতে না পেরে তার সাথে কয়েকজন অফিসার নিয়ে ঝড়ের বেগে কেবিনেট রুমে প্রবেশ করে খন্দকার মোশতাকের দিক তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠেন You are a murderer and userpur. You can not remain as President and I put you under arrest you have no right to remain in power and you have to resign now. এতে কেবিনেটে উপস্থিত সকলে মধ্যে প্রচন্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সাফায়াত জামিলের ধমক আর Ultimalun এর প্রেক্ষিতে উপস্থিত মন্ত্রীদের প্রায় সকলেই ভীষণ ভাবে ভীত হয়ে পড়েন খোন্দকার মোশতাক নিজেও পরিস্থিতির উত্তাপ আঁচ করে ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েন। ঠিক সে সময়েই জেনারেল ওসমানী কক্ষে প্রবেশ করে সাফায়াত জামিলকে নিবৃত করার চেষ্টা করেন । যদিও সাফায়াত জামিল ওসমানীকে অসম্মান করলেন না তবে তার

কথাতেও তিনি তেমন কোন আমল দিলেন না। ওসমানীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি খুব বেশী শান্ত না হলেও কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিল। সাফায়াত জামিল কয়েকজন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এ ক'জন মন্ত্রীকেই আমি বঙ্গভবনে ঢুকতে পুলিশ প্রহরায় জেলে নিয়ে যেতে দেখেছি। খন্দকার মোশতাক আহমেদকে সশস্ত্র প্রহরায় বঙ্গভবনেই প্রহরাধীন রাখা হয়।

চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শুনছিলাম আর ভাবছিলাম এর পরে কি? এদিকে খালেদ মোশারফের কাছে খবর এল দেশে সরকারের শূন্যতার সুযোগে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা রাস্তায় মিছিল করে জেলহত্যার বিচার দাবী করতে করতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর দিকে যাচ্ছে এবং এর নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং খালেদ মোশারফের মাতা। এ মিছিলের ছবি পরের দিন পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয় ঠিক খালেদ মোশারফেরকে র‍্যাংক পরানোর ছবির নীচে। আরও খবর আসে জেলে যে চারজন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে তাদের মৃতদেহ তিন নেতার মাজারের পাশে সমাহিত করার চেষ্টা করছে। খালেদ মোশারফ আইজি পুলিশকে ডেকে সমস্ত মিছিল, সভাসমিতি বন্ধ করতে বল-লেন। আর তিন নেতার মাজার ঘিরে রাখতে বলা হয়। পরে যদিও তিননেতার মাজারে কাউকেই দাফন করা হয়নি কিন্তু পুলিশ মিছল আর সভা সমিতি বন্ধ করতে বিশেষ কোন চেষ্টা করেনি। মনে হয় সে সময় কার্যত সরকার না থাকাতে হয়ত বা পুলিশ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। আর পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তাই খালেদ মোশারফের জন্য সর্বনাশের কাল হয়ে দাঁড়ায়। মনে হল দেশের পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। সেখানে বসেই শুনলাম খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে আর থাকছেন না, প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতির পদে নিয়োগ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হল যদিও তখন পর্যন্ত খন্দকার মোশতাকই নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হল দেশে মার্শাল 'ল' ঘোষণা করা হবে। সবই হবে তবে কার্যত সেদিন কিছুই করা হল না। দেশের জনগণ সেদিনও জানতে পারলেন না ঢাকায় কি ঘটে যাচ্ছে। আমার সাথে কমান্ডারের দেখা হল এসব ঘটনা শুনে এডিসির রুম থেকে বের হবার পর তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে। কমান্ডারের সাথে আমার কোন বাক্য বিনিময় হয়নি তবে তাকে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত আর ক্লান্ত মনে হল। তিনি বোধ করি এসব ঘটনার পর বঙ্গভবন ত্যাগ করলে আমিও রাতে সোজা বাসায় ফিরে যাই। তবে বঙ্গভবনে সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা কোনদিনই ভুলব বলে মনে হয় না। আমি বঙ্গভবন থেকে

ফিরে আসতে আসতে জেনারেল ওসমানীর কথা ভাবছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আর একজন নীতিবান রাজনীতিক হিসেবে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মর্যাদার জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব কেনই বা এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে জড়ালেন?এর জবাব তিনিই দিতে পারতেন।

পরেরদিন ৫ই নভেম্বর সকাল প্রায় ১০টার দিকে ৪র্থ বেঙ্গলে গেলে জানতে পারলাম কমান্ডার বঙ্গভবনের দিকে যাওয়ার পূর্বে আমার খোঁজ করেছিলেন সময় নষ্ট না করে আমিও বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। সকাল প্রায় সাড়ে দশটার দিকে বঙ্গভবনে গিয়ে হাজির হলাম। মেইন হলে ঢুকতেই ক্যাপটেন কবিরের সাথে দেখা। সে প্রাক্তন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর এডিসি ছিল। তাকে সেখানে দেখে মনে হল সে এখন খালেদ মোশারফের এডিসির কাজ করছে। আমাকে সে জানালো খালেদ মোশারফ মেজর জেনারেলের র‍্যাংকে উন্নীত হয়েছে। তাই সে সময় কবির র‍্যাংক ইনিসিগনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এ বিষয়ে সে আমার সাহায্য চাইলে আমি তাকে সেনানিবাস থেকে র‍্যাংকে ইনসিগনিয়া সংগ্রহ করতে বলে কমান্ডারের খোঁজে বঙ্গভবনের ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম খালেদ মোশারফকে মেজর জেনারেলের র‍্যাংক পড়ালেন। বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানদ্বয়। আমি সাফায়াত জামিলের খোঁজে রাষ্ট্রপতির এডিসির কামরায় উকি মারতেই দেখলাম ৪ বেঙ্গলের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল এজে এম আমিনুল হক গম্ভীর ভাবে বসে আছেন, সামনে একটি টেপ রেকর্ডার ও কিছু কাগজপত্র রাখা। তাকে দেখে মনে হল তিনি হতবিহবল, ক্লান্ত আর কিছুটা কিংকর্তব্য বিমূঢ়। কিছুক্ষণ কমান্ডারকে খুজে না পেয়ে আর গতরাতের কেবিনেট মিটিং পরের উত্তেজনাকর বিরাজমান পরিস্থিতি এবং বঙ্গভবনেই আটক খন্দকার মোশতাককে উৎসক্যের কারণে এক নজর দেখে সোজা আবার সেনানিবাসের দিকে চলে এলাম।

বঙ্গভবন থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ৪ বেঙ্গলের অফিসে আবার ফিরে এলাম। সেখানে কাউকেই পেলাম না। শুনলাম এ জে এম আমিনুল হককে নবনিযুক্ত সেনাপ্রধানের একান্ত সচিব হিসেবে সেনাসদরে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি ৪ বেঙ্গল অফিস থেকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে আমার অফিসে চলে যাই। সেখানেই শুনলাম সন্ধ্যার দিকে নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ সেনাসদর অডিটোরিয়ামে অফিসারদের সাথে কথা

বলবেন। বিকেলের দিকে ৪ই বেঙ্গলে কমান্ডারের সাথে দেখা হয়, সাথে কর্নেল কেএন হুদা আর লেঃ কর্নেল জাফর ইমাম। শুনলাম তারা দুপুরের পরেই ফ্লাইং ক্লাবের একটি বিমানে চড়ে ঢাকায় এসেছেন। সাফায়াত জামিল কর্নেল হুদা আর তার ব্রিগেড ইউনিটের এভাবে ঢাকায় আগমন সহজভাবে নিতে পারেননি। আমার বিশ্লেষণে মনে হয় ৭২ ব্রিগেডকে আনা হয়েছিল খালেদ মোশারফের কোন প্ল্যান অনুযায়ী। হয়ত ১০ই বেঙ্গলকে এবং ১৫ই বেঙ্গল যেটা তখনও নদীর অপর পারে, আনার প্ল্যান করা হয়েছিল ঢাকার ব্রিগেডকে Balance করার জন্য । ব্যাপারটা সাফায়াত জামিলও উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু প্রকাশ্য এমন কোন ইঙ্গিত দেন নি। জাফর ইমাম অবশ্য পরের দিন তার ইউনিটেই ফিরে যায়।

সন্ধ্যার পরে সেনাসদরে গেলে সেখানে তিন বাহিনী প্রধান ও অন্য অফিসারদের সমবেত করে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান সম্যক ধারণা দিলেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করলেন। খালেদ মোশাররফ জানালেন যেহেতু খন্দকার মোশাতাক রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কাজেই তার স্থলে একজন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। অনেক তর্ক-বিতর্ক আর আলোচনার পর রাত প্রায় ন'টা কি দশটার দিকে সাব্যস্ত হল প্রধান বিচারপতিকেই রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেয়া হবে। আর প্রধান মার্শাল 'ল' এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে রাষ্ট্রপতিই থাকবেন এবং তিনবাহিনী প্রধানগণ উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন যদিও এ সিদ্ধান্তে খালেদ মোশারফ খুব সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তবে তাকে সকলের চাপের মুখে এ ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হল। রাত প্রায় ১০টা বেজে যাওয়ায় সভাশেষ হয়ে যায়। সভা শেষের পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মার্শাল 'ল' রেগুলেশন তৈরী করার জন্য বিশেষজ্ঞদের ডাকার আর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতির পদগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতে যাবেন এবং পরের দিনই কোন এক সময়ে তাকে শপথ গ্রহণ করানো হবে। আমি সভা শেষ হওয়ার পরপরই সেনাসদর থেকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে চলে আসি।

৫ই নভেম্বর দুপুর পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি পাওয়া যাচ্ছিলনা। আগের দিন অনেক রাত হয়ে যাওয়াতে প্রধান বিচারপতিকে সে রাতে প্রস্তাব না দিয়ে সকালে প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। পরে সকলের পীড়াপীড়িতে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশের

প্রধান বিচারপতি, বঙ্গভবনে যেতে রাজি হলেন। তাঁকে খালেদ মোশারফের তরফ থেকেও আশ্বাস দেয় হয় যে, তিনি রাষ্ট্রপতির পূর্ণ মর্যাদা পাবেন। এ এক আজব ব্যাপার। কেউ সারাজীবনে অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও ক্ষমতার স্বাদ পেতে চান আর সায়েম সাহেবের মত লোককে ক্ষমতা হাতে দেয়া সত্ত্বেও অনীহা প্রকাশ করেন। বিচারপতি সায়েম দুপুরের দিকে বঙ্গভবনে পৌঁছলে জেনারেল ওসমানীকে দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হন। সাব্যস্ত হয় দুপুরের পরে কোন এক সময়ে প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করানো হবে। এর মধ্যে কোন এক সময়ে আমিনুল হকের সাথে দেখা হলে তিনি অর্থপূর্ণ হাসি হেসে জানালেন এক দিনের মধ্যেই মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রায় ১৮০টি অভিনন্দন পত্র এসেছে সকল স্তরের সেনা অফিসারদের কাছ থেকে। আর প্রায় দু'দিন পর ঐ অফিসাররাই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে এমনি ভাবে অভিনন্দন জানাবেন। এদিকে বিচারপতি সায়েম বঙ্গভবনে কিছুক্ষণ থেকে আবার নিজের বাসায় চলে যান। সন্ধ্যার দিকে আবার তিন বাহিনী প্রধান, জেনারেল ওসমানী আর মেজর জেনারেল খলিল তাঁকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে শেষাবধি ৬ই নভেম্বর সকালে আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমকে সপথ গ্রহণে রাজি করান। এক অনাড়ম্বর শপথ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম পঞ্চম রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

ঢাকা গুজবের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। আর এ সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গুপ্ত দলগুলোও বিভিন্ন ধরনের প্রচারপত্র বিলি করতে লাগল। ওদিকে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা সভাসমিতি চালিয়ে যেতে লাগল কিন্তু তারা জানতেই পারলনা যে, তাদের এসব কার্যকলাপের ফলে সশস্ত্রবাহিনীর অভ্যন্তরে জন্ম নিতে লাগল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। একদিনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের প্রচুর প্রচার পত্র সশস্ত্রবাহিনীর ভেতরে বিতরণ করা শুরু হল। প্রায় সবগুলোতেই খালেদ মোশারফকে Pro-Indian বলে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। থমথমে আর অশ্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সর্বত্র বিশেষ করে ঢাকা সেনানিবাসে। ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল ব্রিগেডের সকল অধিনায়কদের কনফারেন্স ডাকলেন। পরিস্থিতি সম্বন্ধে খোলামেলা আলোচনাও হল। সন্ধ্যা ৭টায় রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশে অত্যন্ত গোছানো, মার্জিত আর সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সাথে ভাতৃত্ব

বন্ধন আরও দৃঢ় করার কথা বলেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্কের কথা বললেন। তাঁর বক্তব্যে কখনও মনে হয়নি যে ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থান এক Pro-Indian বা আওয়ামী লীগ সমর্থিত অভ্যুত্থান। কিন্তু এ কয়েক দিনের গুজবে যে ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। ভাষণ শেষে আমি সম্মেলন কক্ষ থেকে বের হলে অফিসের এক কোণায় ব্রিগেডের করনিকদের এক জটলা দেখে সেদিকে গেলে আমার ব্রাঞ্চের প্রধান করনিক সুবেদার (পরে অনারারি ক্যাপটেন) মোসলেম উদ্দিনকে দেখে তার দিকে এগুতেই বললেন, 'স্যার একটা গুজব শুনলাম যে খালেদ মোশারফ নিহত হয়েছেন কিছুক্ষণ আগে'। আমি তার কথাটাকে নিছক গুজব বলে এসব কানে না দিতে বললাম। কিন্তু তখন কি ভাবতে পেরেছি যে, আর কয়েক ঘন্টা পরে সত্যসত্যই খালেদ মোশারফ, রংপুর কমান্ডার কেএন হুদা আর চট্রগ্রাম থেকে আগত লেঃ কর্নেল হায়দার সৈনিকদের হাতে প্রাণ দিতে যাচ্ছেন। মোসলেম উদ্দিন আবারও জানালো কিছু প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামক এক সংগঠন থেকে তাতে খালেদ মোশারফ চক্রকে ভারতীয় চর হিসেবে আখ্যায়িত করে তাকে উৎখাত করার আহবান জানানো হয়। তার কথা শুনে এবার আমি কিছুটা চিন্তিত হলাম কারণ বিকেল থেকে একই ধরনের গুজব শুনে আসছি। ব্রিগেড কমান্ডার কনফারেন্স রুম থেকে বাইরে এলে গুজবগুলো আর লিফলেটের কথাগুলো তাকে সবিস্তারে জানালাম। সব শুনে তাকে বেশ চিন্তিত মনে হল। শুধু বললেন আমাদের অনেক ভুল হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি বঙ্গভবনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং সাথে ২ ফিল্ড রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আনোয়ার হোসেনকে নিলেন। বঙ্গভবনে তখন রাষ্ট্রপতির সাথে মার্শাল 'ল' রেগুলেশান প্রস্তুত করণ ও অন্যান্য বিষেয়ের উপর আলোচনার জন্য তিনি বঙ্গভবনের দিকে রওয়ানা হওয়ার আগেই আমি তার অনুমতি নিয়ে বাসায় চলে এলাম। বাসায় পৌছেই খুব ক্লান্ত বোধ করলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। মধ্যেরাতে, ৬-৭ নভেম্বর, হঠাৎ প্রচন্ড গোলাগুলীর আওয়াজ আর জিন্দাবাদ ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এয়ারপোর্টের (তেজগাঁও পুরানা বিমানবন্দর) দিক থেকে আকাশে 'ট্রেসার রাউন্ডের' আগুনের মত রক্তিম গুলীগুলো দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে ভারী গাড়ীর আওয়াজ আর ট্যাংকের ঘরঘরানির মধ্যে দিয়ে শুরু হল ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব। ৩রা নভেম্বরে খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানের পাল্টা জবাব।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ বীর উত্তম।

ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেডের তৎকালীন কমান্ডার

কর্নেল সাফায়াত জামিল (অবঃ) বীর বিক্রম।

সাত

৩রা নভেম্বর থেকে ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি দেশে বিরাজ করছিল সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে এ কয়দিন দেশে কোন সরকার ছিলনা। দেশের জনগণ দারুণ উৎকণ্ঠা আর হতাশার মধ্যে কাটায়। খন্দকার মোশতাক আহমেদ বঙ্গভবনে থাকলেও কার্যত রাষ্ট্রপতি ছিলেন না বরং তিনি বঙ্গভবনে সশস্ত্র প্রহরায় এক প্রকার বন্দী ছিলেন। অন্যদিকে খালেদ মোশারফও কোন পর্যায়ে সরকারের কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে চাননি। এ ক'দিনের মধ্যে তিনি কখনই নিজের অবস্থান ও তার নিজের ভূমিকা নির্ধারণ করতে চেষ্টাও করেননি। অল্প কথায় তার এ পাল্টা অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বস্তরের সৈনিকদের সম্যক ধারণা দিতে পারেননি এবং এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পারেন নি। এ পাল্টা অভ্যুত্থান কোন নীল নকশা অনুযায়ী করা হয় নি। হলে প্রত্যেক পদক্ষেপই পূর্ব পরিকল্পনার ছকে হত। এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তা না হয়ে একটি দেশের ক্ষমতা নিয়ে কানামাছির খেলার মতই খেলা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এ অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য সীমিত রেখেই ঘটানো হয়েছিল কিন্তু ঘটনা প্রবাহ এমনভাবে গড়ায় যে এর আকারের গভীরতা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে জটিল আকার ধারণ করে। এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই এগুলোকে মোকাবেলা করার পদক্ষেপ আগেভাগেই নিশ্চিত করা উচিত ছিল। সেনা প্রধানকে সরিয়ে খালেদ মোশারফের সেনাপ্রধান হওয়া, নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ইত্যাদিতে সময় ক্ষেপণ না করে নিজের স্কন্ধে সব দায়দায়িত্ব নিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে নিজেই ক্ষমতা দখল করলে বিপ্লবী সেনিক সংস্থা নামক সংগঠন গঠিত হওয়ার সময় পেতনা। সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে হয়ত এ ধরনের নজীর অত্যন্ত বিরল যেখানে একটি অবৈধ সরকারের (মোশাতাক সরকার) কাছ থেকে বৈধতার ছাপ নেয়ার আদৌও কোন প্রয়োজন ছিল কিনা তা খতিয়েও দেখা হয়নি। এ সব করতে গিয়ে যে সময়

ক্ষেপণ করা হয় তাতে অনভিপ্রেত গুজবের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপে এ অভ্যুত্থানে শুরু থেকেই ছিল অপরিপক্বতার ছাপ।

গুজব উঠে যে এ অভ্যুত্থান Pro-Indian বা Indian sponsored, যা একেবারে যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন। খালেদ মোশারফ আর সাফায়াত জামিল দু'জনেই ছিলেন প্রখর জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৈনিক। খালেদ মোশারফ মুক্তিযুদ্ধে শুধু স্বকীয় অবদানই রাখেন নি, তিনি গুরতর আহত হয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যান। দু'জনেই ছিলেন অত্যন্ত চৌকস সৈনিক। এ অভ্যুত্থান যদি Pro-Indian বা Indian Sponsored হত তা হলে এর একটা পূর্ব পরিকল্পনা বা নীল নকশা থাকত এবং তা হত আরও Systematic আর যদি কোন বিদেশী সহযোগিতা থাকত তা হলে খালেদ মোশারফ নিজে ক্ষমতা দখল না করে খন্দকার মোশতাককে বহাল রাখার চেষ্টা বা তার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করার কোন প্রশ্নই উঠত না।

৪ঠা নভেম্বর সকালে Indian Military Attache নিজ উদ্যোগে যে প্যাকেটটি খালেদ মোশারফের জন্য এনেছিলেন তার মধ্যে ছিল ভারতে প্রস্তুত করা Service Dress এর এক প্রস্থ কাপড়। ১৫ই আগস্টের পূর্বেই খালেদ মোশারফ এ কাপড়ের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। প্রসঙ্গত সে সময় সেনাবাহিনীর ইউনিফরমের কাপড় ভারত থেকেই আনা হত। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে, ব্রিগেডিয়ার ভোরার অহেতুক আগমন ও সামান্য উপহার অনেক গুজবের জন্ম দেয় যা খালেদ মোশারফের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থান যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার জন্যই সংগঠিত হয় স্বভাবতই পরবর্তী যে কোন পাল্টা অভ্যুত্থান সাধারণ মানু-ষের দৃষ্টিতে মনে হবে আওয়অমী লীগ সমর্থিত। কিন্তু ৩রা নভেম্বরের পরে পূর্বের কিছুই পরিবর্তন করা হয় নি। রেডিও বাংলাদেশের নাম বা জিন্দাবাদ ধ্বনিকে পরিবর্তন করার কোন চেষ্টা করা হয় নি। যে ভুলটা করা হয়েছিল তা ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থকদের রাস্তায় নামতে দেয়া। পুলিশ প্রশাসনকে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হলে কার্যত পুলিশ প্রশাসনও এর গুরুত্ব দেয়নি। খালেদ মোশারফের জন্য সবচেয়ে বিব্রত কর আর ক্ষতিকর যা ঘটেছিল তা হল তার মাতা ও ভাইয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত মিছিলে অগ্রভাগে যোগ দেয়া আর তা পত্রিকায় ফলাও করে খবর ও ছবি ছাপানো। কারণ তখন কোন সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়নি। এ ঘটনার পর খালেদ মোশারফ নিজে তার মাকে উদ্বেগের

কথা জানান। কিন্তু কার্যত তিনি বা সাফায়াত জামিলও এর বিরুদ্ধেও কোন বক্তব্য দেননি। বস্তুতপক্ষে এ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারী কারও সাথে জেলে আটক নেতৃবৃন্দ বা বাইরের কোন নেতার সাথে কোন পর্যায়ই যোগাযোগ হয়নি বা তারা তা করার চেষ্টাও করেননি। এটা ছিল নিছক একটা ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তর থেকে যখন কোন অভ্যুত্থান ঘটে সে অভ্যুত্থান পারতপক্ষে নিজের গলায় ফাঁসীর রশি ঝুলিয়ে অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য নয়। এমন নজীর সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে বিরল বরং এর উল্টো হতেও দেখা যায়। সমগ্র অভ্যুত্থানের সূত্রপাতই হয় উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা আর ক্ষমতার শীর্ষে পৌছার জন্য। এসব অভ্যুত্থান তৃতীয় বিশ্বে কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক ব্যর্থতা থেকেই হয় তবে এর পেছনে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক সাপোর্ট থাকলেও থাকতে পারে। ঠিক এমনিভাবে ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে খালেদ মোশারফও ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে এসেছিলেন, কোন রাজনৈতিক পার্টিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নয়। কাজেই খালেদ মোশারফ যে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন তা যুক্তিতে টেকে না। তবে এটা সত্য খালেদ মোশারফ অভ্যুত্থানের পরবর্তী পর্যায়ে এ অভ্যুত্থানের ফসল ধরে রাখতে না পারায় ঢাকা সেনানিবাসের বাইরের ঘটনা প্রবাহকে আয়ত্তে আনতে পারেন নি বা আয়ত্তে আনার চেষ্টাও করেন নি।

সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরেও খালেদ মোশারফ ও তার সঙ্গীদের সাথে সাধারণ সৈনিকদের কোন যোগাযোগ না থাকায় সৈনিকদের সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকায় নানা ধরনের সংস্থা শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়। জনপ্রিয়তার দিক থেকে সেনাবাহিনীতে খালেদ মোশারফের চেয়ে জিয়াউর রহমান অধিক অগ্রে ছিলেন। তার গ্রেফতার এবং বিশেষ করে গ্রেফতার করে সেনানিবাসের ভেতরেই রাখাতে ঢাকা সেনানিবাসের সৈনিকদের সহানুভূতি জিয়াউর রহমানের পক্ষেই বাড়তে থাকে। এ ছাড়াও খালেদ মোশারফ যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই মারাত্মকভাবে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন থাকায় সৈনিকদের থেকে দূরে সরে যান এবং পরে কোন ব্রিগেডে না গিয়ে অনেকদিন সেনাসদরে থাকায় তিনি সাধারণ সৈনিকদের সাথে পরিচিত হওয়ার কম সুযোগ পান। এসব কারণে সাধারণ সৈনিকদের নিকট খালেদ মোশারফের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে সাফায়াত জামিলের চেয়েও কম ছিল।

খালেদ মোশারফ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন ঠিকই কিন্তু এ অভ্যুত্থানের কোথাও কোন সমন্বয় তিনি করতে পারেননি। এ কয়টা দিনে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকেও কোন কাজে গালাননি। সে জন্য তিনি ভেতরের ও বাইরের কোন খবরই সময় মত পাননি। রংপুর হতে ৭২ ব্রিগেডের ইউনিটগুলোকে ঢাকায় আনার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে যেটা সহজেই অনুমেয় যে, তিনি প্রাক্তন 'কে ফোর্সের' সাপোর্টের জন্যই হয়ত অনেকটা সাফায়াত জামিলের অজ্ঞাতে ৭২ ব্রিগেডের ইউনিট ঢাকায় নিয়ে আসেন। আর প্রায় সবার অগোচরে লেঃ কর্নেল হায়দার সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে খালেদের পক্ষে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা, বিশেষ করে প্রাক্তন 'কে ফোর্সেরদের' সাপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য ছুটি নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু হায়দার সে সময়টুকুও পাননি কারণ ৭ই নভেম্বরে সেও খালেদ মোশারফ, কে,এন হুদার সাথে নিহত হন।

খালেদ মোশারফ প্রথম থেকেই একমাত্র কেএন হুদা ছাড়া আর কোন কমান্ডারদের বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি সব সময়ই ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলীকে (পরে লেঃ জেনারেল, রাষ্ট্রদূত ও বিএনপি থেকে মন্ত্রী) সন্দেহ করতেন। উল্লেখ্য দু'জনেই কোর্স মেট হলেও চাকুরির ক্ষেত্রে দু'জনের মধ্যে কিছুটা Professional Jealousy ছিল।

এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এবং সমস্ত পরিস্থিতির সঠিক নিয়ন্ত্রণ না রাখায় খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থান ৭ই নভেম্বরে তাহের অনুপ্রাণিত সিপাহী বিপ্লবের ব্যাপকতায় তৃণের মত ভেসে যায় সেই সাথে কর্নেল (অবঃ).তাহেরের বিপ্লবের এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এরই ফলে জীবন দিতে হয় শুধু খালেদ মোশরফ হুদা এবং হায়দারকেই নয় তাদের সাথে আরও অনেক নিরীহ অফিসারদের আর এরই জের হিসেবে পরবর্তীতে জন্ম দেয় ছোট বড় আকারের প্রায় ২১টি অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানের।

আট

৭ই নভেম্বর, সময় তখন প্রায় মধ্য রাত পেরিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে গোলাগুলীর আওয়াজ আর জিন্দাবাদের ধ্বনির মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। হকচকিয়ে বিছানা থেকে উঠে গেলাম। বাসার সবাই আতঙ্কিত। আমি পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে সেনানিবাসের প্রধান সড়ক দেখা যায়। অনেক গাড়ী ভর্তি সৈনিকদের নিয়ে আওয়াজ করতে করতে যেতে দেখলাম। কয়েকটি ট্যাংক কে Top Speed এ দক্ষিণ দিকে যেতে দেখলাম। আর দক্ষিণ দিকের আকাশে তেজগাঁও বিমান বন্দরের দিক থেকে আকাশে ছোড়া বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে ট্রেসার রাউন্ড আকাশ রক্তিম করে দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলামনা অকস্মাৎ কি হতে পারে। সন্ধ্যার লিফলেট আর গুজবের কথা মনে পড়ল। একবার মনে করলাম হয়ত ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানে জড়িত ইউনিট আর খালেদ মোশারফের সমর্থক ইউনিটের মধ্য সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাই যদি হয় তবে এ নবীন দেশে যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করা হয়েছিল এ কয়দিনে, তা বোধ হয় শুরু হয়ে গেল। আমার নীচের তলাতেই থাকতেন এনটি এয়ারক্রাফট ইউনিটের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মাশাহেদ চৌধুরী, যার ইউনিটের একটি ব্যাটারি তেজগাঁও বিমান বন্দরে রাখা হয়েছিল বিমান বন্দর বন্ধ করে দেয়ার জন্য। তারা আমাদের ডেকে নিচে তাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি ভবিতব্য অনেক কথাই বললেন কিভাবে তার ইউনিটের এক ব্যাটারি তার নির্দেশ ব্যাতিরকেই বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়ে মোতায়েন করা হয়। আগের দিনের লিফলেট সম্বন্ধেও অনেক কিছু বললেন। তখনও আমরা অনুমান করতে পারিনি যে, বাইরে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে যাচ্ছে। তাদের সাথে কথা বলতে বলতে প্রায় সকাল হয়ে এলো। সারারাত ধরে চলল গোলাগুলীর আওয়াজ। ভোর হতেই তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরে আমার প্রতিবেশী মেজর হারুনের সাথে(পরে কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত) হাঁটতে হাঁটতে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। হারুণ

যেহেতু স্টেশন হেডকোয়ার্টারে স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিল কাজেই সেও আমার সাথে হেঁটেই স্টেশন হেডকোয়ার্টারে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমরা দু' জনেই একসাথে বের হলাম। প্রধান সড়কে উঠতে দুজন পরিচিত অফিসারের দেখা পেলাম। তারা আমাদের দেখে বলল, জেনারেল জিয়াউর রহমানকে এইমাত্র বন্দী অবস্থা থেকে বের করে ২ ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেখানেই আমাদের চলে যেতে বললো। ওখানে অন্যান্য অফিসাররাও আছে।' আর কিছু বলবার সময় তারাও পেল না আর আমরাও কিছু শুনতে পারছিলাম না। পথে উল্টোদিক থেকে একটি সামরিক ট্রাক ভর্তি সৈনিক এবং কিছু বেসামরিক তরুণে ভর্তি হয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় সময় গুলী ছুড়তে ছুড়তে আর ধ্বনি দিতে দিতে দ্রুত গতিতে চলে গেল। এ ধ্বনি আমি প্রথম শুনলাম আর শোনার সাথে সাথে শরীরের রক্ত হীম হয়ে গেল। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল, 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই। সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ'। এ শ্লোগান শোনার পর আমি আর হারুন আরও একটু দ্রুত গতিতে হাঁটতে লাগলাম। পথে আরও দুটি ট্যাংক দ্রুত গতিতে চলে গেল। তার উপরে বসা সামরিক সদস্যদের সাথে অস্ত্রধারী বেসামরিক তরুণ। পরে জানলাম এসব বেসামরিক তরুণরা কর্নেল তাহেরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণবাহিনীর সদস্য। তখনও বুঝতে পারলাম না এটা কাদের এবং কোন ধরনের বিপ্লব। দু একজন তরুণ অফিসারদেরও এসব বিপ্লবী সৈনিকদের সাথে দেখলাম। তাদের কাঁধে কোন ব্যাজেজ অফ র‍্যাংক নেই। একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করাতে জানাল "স্যার আজ থেকে সিপাহী আর অফিসারের মধ্যে র‍্যাংকের কোন পার্থক্য থাকবেনা। সশস্ত্রবাহিনীতে কোন শ্রেণী বিন্যাস থাকবেনা।' এটাই এ বিপ্লবের মূল কথা।' আমার হতবাক হবার পালা, তা হলে কি কর্নেল তাহেরের 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' বিপ্লব ঘটিয়েছে? আর এটাই বোধ হয় তাহেরের শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রপাতের আর প্রথম ধাপে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা। কয়েকটি জীপ আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে বের হয়ে গেল। সৈনিকদের সাথে আগে বর্ণিত জেএসডির গণবাহিনীর সদস্যরা যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের জন্য। যতগুলো গাড়ী গেল তার প্রত্যেকটির মধ্যেই দেখলাম উল্লাসরত সৈনিকরা আকাশের দিকে গুলী ছুড়তে ছুড়তে তার ধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছে। দৃশ্যত মনে হল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট কমান্ড স্ট্রাকচারও সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। এ এক চরম বিশৃঙ্খল

অবস্থা যা স্মরণ কালে কোন সভ্যদেশে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। এখানে যেন কারও কিছু বলার বা করার নেই।

দ্রুত হেঁটে যতশীঘ্র সম্ভব ২ ফিল্ড রেজিমেন্টের প্রধান ফটকে পৌঁছলাম। প্রথমেই দেখা হল ইউনিটের সুবেদার মেজর আনিসের সাথে (পরে অনারারী ক্যাপটেন)। আনিসের সাথে দেখা হতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'স্যার আল্লাহর রহমত আপনাকে পাওয়া গেছে। ব্রিগেড কেউ নেই, কাউকেই পাওয়া যাচ্ছেনা। জিয়া সাহেব আপনাদেরকে খোঁজ করছেন।' সে সংক্ষেপে জানালো, রাত ১২টার দিকে সিপাহী বিপ্লব শুরু হওয়ার পর ১ম বেঙ্গলের গার্ডদের সরিয়ে সকালের দিকে মেজর মহিউদ্দিন (পরে লেঃ কর্নেল) ও এই রেজিমেন্টেরই অন্যান্য সিপাহীরা জিয়াকে তাদের ইউনিটে নিয়ে আসে। এ মুহূর্তে জিয়া অধিনায়কের অফিসে আছেন, তার সাথে আরও কয়েকজন অফিসার ৫৫ ব্রিগেডের যশোরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলীও রয়েছেন। মীর শওকত আলী তার আগের দিন এসেছিলেন ব্রিগেড কমান্ডারদের কনফারেন্সে যেখানে খালেদ মোশারফ সভাপতিত্ব করেন। সেই থেকেই তিনি ঢাকায় থেকে যান। ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট সেদিন বাংলাদেশের ক্ষমতার ক্রেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। স্মরণযোগ্য যে, এই ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট রশীদের নেতৃত্বে ১৫ই আগস্টের বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী দু'টি ইউনিটের একটি। আমরা ২ ফিল্ডে যখন পৌঁছি তখন সেখানে মাত্র ১০ থেকে ১৫ জন অফিসারকেই দেখলাম। সেখানে যে দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছিল তাতে মনে হল বাংলাদেশে সেনাবাহিনী বলে কোনদিন কোন সংস্থা ছিল না। কারও কোন কর্তৃত্ব আছে বা ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। ইউনিট কোয়ার্টার্র গার্ড, যেখানে সামরিক কয়েদী রাখা হয়, সে সেলগুলোতে দেখলাম বেশ কিছু চেনাজানা অফিসার লক আপে রয়েছেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন লেঃ কর্নেল বাহার। সুবেদার মেজর আনিসকে জিজ্ঞেস করাতে সে যে তথ্য দিল তার সারমর্ম হল, বিপ্লবী সৈনিকরা কিছু কিছু অফিসারদের, তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে লিস্ট তৈরী করে তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে হামলা দেয় যার খবর পেয়ে এসব আতঙ্কগ্রস্থ অফিসার পরিবার পরিজন ছেড়ে পালাতে থাকে। এদের মধ্যে যাদেরকে পাওয়া গিয়েছে তাদের জীবন রক্ষার্থে এবং উন্মত্ত সৈনিকদের শান্ত করার জন্য এসব অফিসারদের Protective Custody তে রাখা হয়। অনেক অফিসারই ঢাকা সেনানিবাস ছেড়ে আত্মগোপন করে আছেন, তাদের অনেককেই পাওয়া যাচ্ছেনা। আমি আনিসের বক্তব্যের অন্তরনিহীত ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করে

ধীরে সুস্থে অধিনায়কের অফিসে ঢুকতেই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অধিনায়কের চেয়ারে বসা দেখলাম। তাঁর পাশে সাফারি পরিহিত ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী। আমি ভেতরে গিয়ে অভিবাদন করার পর তিনি (জিয়া) বললেন, 'তুমি ব্রিগেডে চলে যাও, সেখানে সৈনিকদের কন্ট্রোল কর। তোমার কমান্ডারের (সাফায়াত জামিল) সাথে আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি, সে ভালই আছে। আমিনকে নবনিযুক্ত কমান্ডার করা হয়েছে।' আমি তার কথা শোনার পর অফিস থেকে বের হতেই এ জে এম আমিনুল হকের সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি আমাকে কিছু সময় এখানে থেকে সব দেখে শুনে পরিস্থিতি অনুধাবন করার পর ব্রিগেডে যেতে বললেন। তিনি আরও বললেন, যেহেতু ব্রিগেডের আর কোন স্টাফকে পাওয়া যায়নি আর তিনিও নতুন, তাছাড়া এ পরিস্থিতিতে তিনি তার ইউনিট, ৪ই বেঙ্গল ছেড়ে যেতে পারবেন না তাই আমি একাই যেন সব দায়িত্ব পালন করি। আমাকে হাফিজের জায়গায় বিএম এর দায়িত্ব নিতে বললে আমি তাকে আশ্বস্ত করে জানালাম ও দিকটা আমি দেখে রাখব। আমাকে তিনি আরও জানালেন, ব্রিগেড মেজর হাফিজ বা স্টাফ ক্যাপটেন তাজ, কাউকেই সেনানিবাসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জিয়াউর রহমান ২ ফিল্ড রেজিমেন্টে এসেই বঙ্গভবনে খালেদ মোশারফকে খোঁজ করেন কিন্তু পেয়ে যান সাফায়াত জামিলকে। সিপাহী বিপ্লব শুরু হওয়ার খবর পেয়েই খালেদ মোশারফ, হুদা আর হায়দার একসাথে বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সাফায়াত জামিলের সাথে যোগাযোগ করেন। সাফায়াত জামিলকে পেয়ে জিয়াউর রহমান বলেছিলেন 'Forget and forgive. You come back.' তার উত্তরে সাফায়াত জামিল এরকম একটা কিছু বলেছিলেন, 'I am a rebel and will remain so.' সাফায়াত জামিলকে মধ্য রাতে যখন সেনানিবাসে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার খবর দেয়া হয় তখনও তিনি আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেননি কিন্তু যখন জানতে পারলেন তখন বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল। খালেদ মোশারফের বঙ্গভবন ত্যাগ করার পর সাফায়াত জামিল জানতে পারেন যে, তিনি একাই বঙ্গভবনে রয়ে গেছেন। সকালের দিকে জিয়াউর রহমানের ফোন পাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন যে, কিছু বিপ্লবী সৈনিক তাদের খোঁজে বঙ্গভবনে মেইন গেটে পৌঁছেছে। তখনই তিনি বেশ বিচলিত হয়ে ড্রাইভারকে গাড়ীর চাবি হস্তান্তর করে নিজে বঙ্গভবনের পিছনের দেয়াল টপকিয়ে পালাবার সময় তার একটি পা ভেঙ্গে যায়। তিনি এবং তার সাথে বঙ্গভবনে ৪র্থ বেঙ্গলের কোম্পানী

কমান্ডার মেজর দীদার আতাউরের সাথে একটি গাড়ীতে চড়ে ঢাকা চট্টগ্রাম রোড ধরে মেঘনা ফেরীঘাট পর্যন্ত আসেন। যেহেতু সাফায়াত জামিল তার ভাঙ্গা পা নিয়ে আর এগুতে পারছিলেন না এবং দৈবক্রমে সেখানে SDO Narayanganj (তখন নারায়নগঞ্জ মহকুমা ছিল) সমেত তার একটি লঞ্চ নারায়নগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময়ে দীদার আতাউর ও সাফায়াত জামিল নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন বললো SDO Narayanganj তাদেরকে লঞ্চে তুলে সাফায়াত জামিল তাকে থানায় নিয়ে যেতে বলেন। SDO Narayanganj সাফায়াত জামিল এবং দীদারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বন্দর থানায় সোপর্দ করেন। সেখান থেকেই সাফায়াত জামিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে ৭ই নভেম্বর সকালে টেলিফোনে কথা বলেন। কয়েকদিন পরে তাকে সি এম এইচের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। এখনও তিনি পা ভাঙ্গার কারণে কিছুটা খুঁড়িয়ে চলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখতে পেলাম কর্নেল তাহের কিছু সৈনিক আর গণবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ২ ফিল্ড রেজিমেন্টে এসে জিয়াউর রহমানের রুমে ঢুকলেন। প্রথমে একবার দুজনে কোলাকুলি করে পরে তাহের জিয়াউর রহমানকে রেডিও স্টেশনে গিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে বলেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান ওখানে বসেই তাহেরের আসার পূর্বেই অন্যান্য অফিসারদের পরামর্শে তাঁর ভাষণ টেপ করে রেডিওতে পাঠিয়ে দেন। পরে তাহের সৈনিকদের পক্ষ থেকে জিয়াকে কিছু দাবী দাওয়ার লিস্ট দিলে তিনি পরে বিবেচনা করে দেখবেন বলে রেখে দেন। তাহের, জিয়ার এসব আচরণে খুব খুশি হতে পারলেন না। তিনি একান্তে জিয়ার সাথে কিছু কথা বলে উত্তেজিত হয়ে অফিস কক্ষ ত্যাগ করেন। জিয়ার সাথে সেদিন তাহেরের কি কথা হয়েছিল তা আর জানা যায়নি। তবে রেডিও বাংলাদেশ সিপাহী বিপ্লবের শুরু থেকেই অনেক সময় পর্যন্ত বিপ্লবী সৈনিক ও জেএসডির গণবাহিনীর হাতে ছিল এবং জিয়াকে সেখানে স্বশরীরে গিয়ে ভাষণ দেয়া থেকে বিরত করা হয়েছিল এ আশংকায় সে জিয়াকে তাহের সম্পূর্ণভাবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তে ব্যবহার করবে যা তাহের প্রথম থেকেই করতে চেয়েছিলেন। তাহের চেয়েছিলেন জিয়া রেডিওতে গিয়ে সৈনিকদের দাবী দাওয়া এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভবিষ্যৎ রূপ রেখার ঘোষণা দেয়ার জন্য যা হবে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের।

আমি তখনও বাইরে দাঁড়ানো। সেখানে দাঁড়িয়ে সেদিনকার অনেক নাটকীয় দৃশ্য দেখলাম। দেখলাম কয়েকজন সৈনিক কর্নেল মান্নাফ (পরে মেজর

জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) যার কথা আগে বলা হয়েছে, আর তার ব্রিগেড মেজর, মেজর তফসির আহমেদকে রীতিমত চ্যাংদোলা অবস্থায় ধরে নিয়ে এসেছে। এ লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পরে দুজনই অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। তফসির তার মনোবল সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। সুবেদার মেজর আনিস দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে সিপাহীদের কবল হতে উদ্ধার করেন। সিপাহীদের মতে এ দুজনকে তাদের হেডকোয়ার্টার থেকে পালাতে দেখে ধরে নিয়ে এসেছে। কর্নেল মান্নাফ উত্তেজিত হয়ে জিয়াউর রহমানের অফিসে গিয়ে ইস্তফা দিতে চাইলে তিনি তাকে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বুঝিয়ে শান্ত করেন। এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্য সংবাদ এলো শেরে বাংলা নগরের এমপি হোস্টেলে অবস্থানরত ১০ই বেঙ্গলের লাইনেই খালেদ মোশারফ যিনি মুক্তিযুদ্ধেকে ফোর্স কমান্ডার হিসেবে ১০ই বেঙ্গল পুনর্গঠিত করেন, কর্নেল কেএন হুদা, যিনি ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে কয়েকদিন পূর্বে এ ইউনিটকে ঢাকায় নিয়ে আসেন আর লেঃ কর্নেল হায়দার এ তিন জনকেই শেরে বাংলা নগরে এমপি হোস্টেলের সামনেই উচ্ছৃঙ্খল সিপাহীরা নির্মম ভাবে হত্যা করে। জিয়াউর রহমান এ খবর শুনে তাদের মৃতদেহ সেনানিবাসে পাঠাতে বললেন আর এ মৃতদেহগুলো তিনি দেখবেন বলেই ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট এ আনা হচ্ছে। এ খবর শুনে আমার হাত পা সিধিয়ে আসছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি এবং এ বিপ্লবের ভয়াবহতা সম্বন্ধে এতক্ষণ আমি এতটা অনুমান করতেই পারিনি। সমস্ত শরীর কেমন বিষাদময় লাগছিল। দেখলাম ২ ফিল্ড রেজিমেন্টের অধিনায়ক আনোয়ার হোসেনকে তারই ইউনিটের সৈনিকরা খুঁজে বের করে এনেছে। তবে তার কপাল ভাল যে, তিনি কোনভাবে লাঞ্ছিত হননি বরং সৈনিকরা তাকে ঐ পরিস্থিতির মধ্যে সম্মানের সাথেই সেদিন নিয়ে এসেছিল। লেঃ কর্নেল আনোয়ার হোসেন গতরাতে সাফায়াত জামিলে সাথে বঙ্গভবনেই ছিলেন। গতরাতে কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর সাফায়াত জামিল যখন বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন তিনি আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং যখন বঙ্গভবনে খবর এল যে সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে তখন সাফায়াত জামিল তাকে বঙ্গভবন ছেড়ে যেতে বললে তিনি খানিকটা ইতঃস্তত করেন এবং পরে একাই বের হয়ে পথিমধ্যে কোথাও রাত্রি যাপন করে বাসায় ফেরেন। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে আস্তে আস্তে অধিনায়কের পাশের রুমে গিয়ে বসলাম। সেখানে লেঃ কর্নেল নুরুদ্দীন খান (পরে লেঃ জেনারেল ও সেনাপ্রধান) অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে আমাকে বসতে বলে চা খেতে বলেন। এত

উত্তেজনা আর আশঙ্কার মধ্যেও নুরুদ্দীন খানকে অত্যন্ত শান্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিতে আর বিভিন্ন অফিসার ও সেনানিবাসের খবর নিতে দেখলাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন 'খালেদ মোশারফ মারা গিয়েছে শুনেছত?'। আমি মাথা নাড়ালাম। তিনি আরও বললেন 'আনোয়ারের কাছ থেকে শোন।' নুরুদ্দীন খান তখন মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটে যার প্রধান ছিলেন কর্নেল মালেক (পরে জাতীয় পার্টি থেকে মনোনীত ঢাকার মেয়র) যিনি সৈনিকদের তাড়া খেয়ে কয়েকদিন সম্পূর্ণ ভাবে নিরুদ্দেশ ছিলেন। আনোয়ার হোসেনের মুখে খালেদ মোশারফের মৃত্যুর ঘটনা শুনলাম যা পরে আমি আমার কোর্সমেট লেঃ কের্নল নওয়াজীশ আহমেদ, অধিনায়ক ১০ই বেঙ্গলের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনি (পরে কর্নেল এবং ১৯৮১ সনে চট্টগ্রামে জিয়ার হত্যার সাথে জড়িত থাকায় ফাঁসী হয়)।

৭ই নভেম্বর রাত বারটার পর যখন ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তর থেকে সিপাহী বিপ্লবের সূচনা হয় তখন খালেদ মোশারফ এবং অন্যরা বঙ্গভবনেই ছিলেন। সিপাহী বিপ্লবের সূচনাতেই আবার বেঙ্গল ল্যান্সার আর ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট জড়িয়ে পড়ে এর সাথে অন্যান্য নন ইনফেনট্রি ইউনিটই বেশীর ভাগ অংশে জড়িয়ে যায়। এ খবর খালেদ মোশারফের কাছে পৌঁছে এবং এও জনানো হয় যে সিপাহী বিপ্লরের অগ্রভাগে জিয়াউর রহমান রয়েছে আর এতে জড়িত আছে জেএসডির গণবাহিনী যার নেতৃত্ব দিচ্ছে কর্নেল তাহের এবং ৩রা নভেম্বর এর অভ্যুত্থানের নেতাদের প্রাথমিক পর্যায়ে টার্গেট করা হয়েছে। এসব সংবাদ শুনে খালেদ মোশারফ কর্নেল হুদার মাধ্যমে ১০ই বেঙ্গলের অধিনায়ক নওয়াজীশের সাথে যোগাযোগ করলে নওয়াজীশের ইউনিটে তাদেরকে আসার জন্য বলে। কিন্তু সেটা পরে রটে যে, তারা আরিচা পার হয়ে উত্তর বঙ্গের দিকে একটি বেসামরিক গাড়ীতে চলে যাওয়ার পথে আসাদ গেটের নিকট তাদের গাড়ী বিকল হয়ে পড়লে তারা নিকটস্থ একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে কাপড় বদলিয়ে ১০ই বেঙ্গলের দিকে হেঁটে অধিনায়কের অফিসে পৌঁছে। পরে নওয়াজীশ আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে খালেদ মোশারফের তরফ থেকে একটি ফোন পাওয়ার কথা বলে তবে এ কলটি কোথা থেকে তারা করেছিলেন সে সম্বন্ধে সে তখন বলতে পারেনি। খালেদ মোশারফ, কেএন হুদা আর হায়দার তিনজনেই পায়ে হেঁটে অধিনায়কের অফিসে অবস্থান গ্রহণ করেন। ভোরের দিকে জিয়াউর রহমান খালেদ মোশারফের অবস্থান জানার পর তার সাথে কথা বলেন এবং দুজনার

মধ্যে কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে জিয়াউর রহমান নওয়াজীশকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলেন। এ কথা মুরহুম নওয়াজীশ নিজেই আমাকে বলেছিল। নওয়াজীশ সকালের দিকে তাদের নাস্তার বন্দোবস্ত করে এবং তার বর্ণনা মতে এ সময় খালেদ মোশারফ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শান্ত ছিলেন। তবে কর্নেল হুদা আর হায়দার কিছুটা সংকিত হয়ে উঠলে খালেদ মোশারফ স্বাভাবিক সুরে তাদেরকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে বলেন। ইতিমধ্যে সেনানিবাস থেকে কিছু বিপ্লবী সেনিক ১০ই বেঙ্গলের লাইনে এসে এখানকার সৈনিকদের বিপ্লবের স্বপক্ষে উত্তেজিত করতে থাকে আর খালেদ মোশারফ ও তার সঙ্গীদের হস্তান্তর করার জন্য অধিনায়কের উপরে চাপ দিতে থাকে। নওয়াজীশ উত্তেজিত সৈনিকদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ সময়ে খালেদ মোশারফ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও একটি সিগারেট টানতে থাকেন। কর্নেল হুদা আর হায়দার বারংবার নওয়াজীশকে তাদের জীবনের নিরাপত্তার কথা স্মরণ করাতে থাকলে খালেদ মোশারফ আবার বলে উঠলেন 'Do not request for your life take it easy you should have known your fate by now'. এর কিছুক্ষণ পরেই (কথা গুলো মরহুম লেঃ কর্নেল নওয়াজীশের মুখে শোনা। হয়ত কিছুটা তারতম্য হলেও হতে পারে) কিছু সংখ্যক সৈনিক অধিনায়কের অফিসের দরজা এক প্রকার ভেঙ্গে তিনজনকেই বাইরে মাঠে নিয়ে এসে গুলী করে হত্যা করে। এসব সৈনিকদের সাথে দুজন তরুণ অফিসার ও ক্যাপটেন আসাদ ও ক্যাপটেন জলিল, দুজনই ১০ই বেঙ্গলের কোম্পানী কমান্ডার এ হত্যা যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেন।[১] এ দুজন কেন এ হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে তাদের কোন কারণ পাওয়া যায়নি। বেলা তখন প্রায় ৯টা। আমি লেঃ কর্নেল নুরুদ্দীন খানের অফিসে বসা। ততক্ষণে অনেক অফিসারের ভীড়। সেখানে সবার সাথে শান্তভাবে কথা বলে নুরুদ্দীন খান তাদেরকে আশ্বস্ত করে যার যার কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। নুরুদ্দীন খানকে সে সংকটময় মুহূর্তে অত্যন্ত নিরলসভাবে শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামলাতে দেখেছি। এরই মধ্যে সৈনিকদের প্রাথমিক ২২ দফা যা পরে কাটছাট করে ১২ দফার একটি দাবী দাওয়ার লিস্ট বিলি করা হচ্ছিল যার মূল কপিটি জিয়াউর রহমানের হাতে তুলে দেয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সময় থেকে প্রচলিত ব্যাটম্যান প্রথা বাতিল (সৈনিকরা অফিসারদের ব্যক্তিগত কাজে নিয়োজিত হত 'ব্যাটম্যান' নামে),

---

1. *Bangladesh : A legacy of Blood :* opcil page no 109.

সৈনিক আর অফিসারদের বেতনে বৈষম্য দূর করে সৈনিকদের বেতনবৃদ্ধি, মেডিক্যাল এলাউন্সের প্রবর্তন (যদিও মেডিক্যাল ফ্রি ছিল), যাতায়াত ভাতার প্রবর্তন। সৈনিক র‍্যাংক থেকে সরাসরি অফিসার ভর্তি করণ এবং সরাসরি কমিশন প্রদান বন্ধ করণ, ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের হোতাদের শাস্তির বিধান করণ। ৭ই নভেম্বরকে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা, অফিসারদের মত সৈনিকদের মেসের প্রবর্তন ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, সৈনিকদের ফ্রি খাবারের বিধান আছে আর অফিসার মেসে খাবারের বিল অফিসারদের পরিশোধ করতে হয়।

আমি নুরুদ্দীন খানের অফিসে বসে থাকতে থাকতেই জিয়াউর রহমান মীর শওকত আলী প্রমুখ বাইরে কোথাও রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইতিপূর্বেই জিয়াউর রহমানের পূর্বে ধারণকৃত দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ খানি রেডিওতে প্রচার করা হয় তবে সে ভাষণে সৈনিকদের দাবীদাওয়া গ্রহণের কোন কথা বলা হয়নি। বরং সৈনিকদের শান্ত ও শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে বলেন। আর দেশবাসীকে শান্ত থেকে যার যার কর্মক্ষেত্রে যেতে বলেন। যথারীতি সরকারের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বলেন। তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে আর শেষ করে ছিলেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' দিয়ে। প্রায় ১১টার দিকে খালেদ মোশারফ আর তার সঙ্গীদের মৃতদেহ একটি বেসামরিক ট্রাক করে ২ ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে এলে সেখানে উৎসুক দর্শকদের ভীড় জমে উঠে। পরে সেখান থেকে গাড়ী শুদ্ধ মৃতদেহ গুলো সি এম এইচ এ পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি হায়দারের মৃতদেহ দেখে কিছুটা মুহ্যমান হই। কারণ হয়দার যখন তরুণ অফিসার তখন থেকেই আমি তাকে চিনতাম। বেশ স্মার্ট অফিসার হিসেবেই তার পরিচিতি ছিল পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়ে। সে আর্টিলারী থেকে এসএসজি (স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ) যাকে সাধারণত কমান্ডো বলা হয়, প্রশিক্ষণ নেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ২ সেক্টরে, যার সেক্টর কমান্ডার প্রাথমিকভাবে খালেদ মোশারফ ছিলেন। হায়দার ফ্রিডম ফাইটারদের নেতৃত্বে নিযুক্ত হন। পরে যখন খালেদ মোশারফকে ফোর্স কমান্ডার হলেন তখন হায়দারই মূলত সেক্টরের অনিমিয়ত বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ চালিয়ে যান। হায়দার মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত বান্দরবানের রুমাতে ৮ই বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন। মৃত্যুই হয়ত তাকে সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রামের রুমা থেকে ঢাকায় ডেকে আনে। হায়দারের ঢাকায় আগমন সম্বন্ধে অনেকেই জানতেন না।

আমি কয়েক ঘন্টা লেঃ কর্নেল নরুদ্দীন খানের অফিসে বসে কাটাই আর ভাবতে থাকি আমার এ পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। প্রায় দুপুরের দিকে ব্রিগেড

হেডকোয়ার্টার থেকে একটি জীপে ব্রিগেডের সিনিয়র জেসিও(জুনিয়র কমিশনড অফিসার) ও আরও কিছু সৈনিক খবর পেয়ে আমাকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে উপস্থিত হল। আমি ঠিক মন স্থির করতে পারছিলাম না যে, এহেন পরিস্থিতেতে আমার এভাবে সশস্ত্র সৈনিকদের সাথে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। অনেক সাহস সঞ্চয় করে তাদের সাথে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে যাওয়াই মনস্থ করলাম। তবে রওয়ানা হওয়ার আগে লেঃ কর্নেল নুরুদ্দীন খানের সাথে দেখা করে তাকে জানালাম। তিনি অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, খোদা হাফেজ । যাবার সময় তিনি বললেন, যাই হোক তোমার সাহস আর অফিসার কোয়ালিটি 'Will take care of you.'

আমি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পৌছে আমার অফিসেই গেলাম। সমস্ত অফিস জনমানব শূন্য। শহরে তখন সিপাহী জনতার উল্লাস চলছে কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারেননি তখন যে উল্লাসের পিছনে কি রক্তাক্ত ক্ষমতার লড়াই চলছে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে। শহরে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে গুঞ্জরিত চারদিক। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর আবার ব্রিগেডের সিনিয়র জেসিও এসে উপস্থিত হল তার দলবল সমেত। আমাকে ব্রিগেড লাইনে নিয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিগেড লাইনে গিয়ে দেখলাম আমার রাতের আহার আর রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাকে পেয়ে সকল সৈনিকই উৎফুল্ল হয়ে তাদের বিপ্লবের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানালো। কয়েকজন সৈনিক বলে উঠল 'স্যার, সারারাত আমরা ব্রিগেডের কোন অফিসারকে আমাদের সাথে পাইনি '। পরে জানলাম আপনি সপরিবারে বাসায় আছেন তবে অত রাতে আপনার বাসায় আমরা যাই নি পরিস্থিতির কারণে। আমি সন্ধ্যায় কিছু ডাল রুটি খেয়ে বাসায় আমার অবস্থান জানিয়ে রাখলাম। আমি রাতে সৈনিকদের সাথে থাকার মনস্থ করলে আমার এক করনিক নায়েক আজিম বলল 'স্যার আজ রাতটা আপনি লাইনে না থেকে আমার বাসায় থাকবেন।' সে আমাকে একরকম জোর করে তার বাসায় নিয়ে গেল। তখনও বুঝতে পারিনি এ রাতেই মানে ৭/৮-ই নভেম্বরে আরও কয়েকজন অফিসারকে হত্যা করা হবে।

পরের দিন, ৮ই নভেম্বরে জিয়াউর রহমান আবার সেনাপ্রধানের পদে সেনাসদরে পৌছলেন। ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী খালেদ মোশারফের জায়গায় সিজিএস হিসেবে নিযুক্ত হলেন। সেদিন সকালেই শুনতে পেলাম চার জন অফিসারকে সিপাহীরা হত্যা করেছে। এদের মধ্যে হামিদা নামে এক লেডি ডক্টর আর একজন ডেন্টাল সার্জন করিমকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রোশে হত্যা

করা হয়। আর দুজন অফিসার ক্যাপটেন আনোয়ার আর লেফটেনেন্ট মোস্তাফিজ যারা বাংলাদেশ হকি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল তাদেরকে টিভি স্টেশনের কাছে তাড়া দিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। সেদিনই প্রায় দশ টার দিকে বিমান বন্দরে আরেকজন অফিসার, মেজর আজিমকে যিনি নিজের কাজ সেরে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন তাকে হত্যা করা হয়। এসব হত্যার খবর সেদিনই যখন জনসাধারণ জানতে পারে তাদের মধ্যেও এ অভ্যুত্থান নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। জনগণ আর আগের দিনের মত এ অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য নিয়ে উৎফুল্ল হতে পারলনা।

৮ই নভেম্বর থেকে অতি দ্রুত ও দৃঢ়তার সাথে জিয়াউর রহমান সমগ্র সেনানিবাসে ঘুরে সৈনিকদের সাথে কথা বললেন। বিভিন্ন সমাবেশে তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে সেনাবাহিনীর Chain of Command establish করার কথা বলতে লাগলেন। সেদিন বিকেলের দিকে তিনি ৪ বেঙ্গলের লাইনের কাছে ঢাকা সেনানিবাসের সৈনিকদের ডেকে সেখানে কথা বললেন। আশ্চর্য হলাম সেদিন ঢাকা সেনানিবাসে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ঐ সমাবেশ ছিল সশস্ত্র অস্ত্রের মহড়া কারণ মাত্র এই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন অফিসার ছাড়া আর সমস্ত সৈনিকই ছিল সশস্ত্র।

দৃঢ় কণ্ঠে জিয়াউর রহমান অস্ত্র জমা দিয়ে সৈনিকদের নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে যেতে বললেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, সৈনিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া তিনি গ্রহণ করবেন এবং অতি সত্বর এর উপর বিচার বিবেচনা করে যথা সময়ে জানাবেন। তিনি এ ঘোষণা সরকারের পক্ষ থেকে দেন। যদিও তখন আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। তার আগের দিন, মানে ৭ই নভেম্বর দুপুরের দিকে জিয়াউর রহমান রেডিও স্টেশনে গেলে তাহের এবং সৈনিকদের চাপে তিনি সংশোধিত দাবীগুলো নীতিগতভাবে মেনে নেন। এক্ষণে তিনি সে সব দাবীর কথাই জানালেন।

সভায় তিনি সৈনিক শৃংখলা আর অস্ত্র জমা দেয়ার কথা বলার সময় একজন সৈনিক নিজের এক্সিডেন্টাল গুলীতে নিহত হন। সৈনিকরা যার যার অস্ত্র জমা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

সেদিন বিকেলের দিকে অস্ত্র জমা দেয়া হলে কিছু সংখ্যক সৈনিক যারা কর্নেল (অবঃ) তাহেরের সৈনিক সংস্থার Hard Core ছিল তারা বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনামূলক প্রচার চালাতে শুরু করল। ঠিক সন্ধ্যার সময় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কিছু সংখ্যক সৈনিক অর্ডিন্যান্স মেস থেকে নীরিহ তিনজন অফিসারকে টেনে নিয়ে মেসের সামনেই হত্যা করে।

আবার শুরু হয় ঢাকা সেনানিবাসে নতুন করে উত্তেজনা। ওদিকে অন্যান্য সেনানিবাসে ৭ই নভেম্বরের সেনাবিদ্রোহের পর কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বা অফিসার মারার মত ঘটনা ঘটনি তবে অনেক অফিসারকেই নাজেহাল হতে হয় উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের হাতে।

সেদিন ৮ই নভেম্বর, রাত প্রায় নয়টার দিকে আমি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে বসা। সে সময় ব্রিগেডের সিগন্যাল অপারেটর এসে খবর দিল, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সে রাতেও বেশকিছু অফিসার নিধনের লিস্ট তৈরী করেছে।

সে যা জানালো তার বিবরণ হল সৈনিকদের সব দাবী মানা না হলে এ সংগ্রাম চলতেই থাকবে। সে আরও জানালো যে, অফিসার নিধনের সাথে মাত্র গুটি কয়েক সৈনিকই জড়িত বিশেষ করে কিছু সিগ্‌ন্যাল, ল্যান্সার আর সামরিক করনিকদের মধ্যেই 'সৈনিক সংস্থা' ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে।

তাহেরের প্ল্যান যদি কার্যকর হত তবে সেদিন রাতে এবং পরের কয়েকদিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীর 'কমান্ড স্ট্রাকচার' ভেঙ্গে দিয়ে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা হত। তাহের সাধারণ সৈনিকদের দলে টানে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার উছিলায় এবং অফিসারদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবহারের অপপ্রচারের মাধ্যমে প্ল্যান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর স্ট্রাকচার শেষ করার পর বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উপরও একই ধরনের হামলা হত। তাতে দেশ চলে যেত এক বিশৃঙ্খল অবস্থায়। অবশেষে বিপন্ন হত দেশের সার্বভৌমত্ব আর স্বাধীনতা। জিয়াউর রহমান তাহেরের অভিলাষ বোঝার পর থেকেই তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে রেখে সৈনিকদের নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য ক্ষিপ্রতার সাথে পদক্ষেপ নিতে থাকেন। জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা আর ব্যক্তিত্ব, সাহস আর ত্বরিত পদক্ষেপের জন্য দু একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

রাত প্রায় দশটার সময় সেনাসদর থেকে কর্ণেল নুরুদ্দীন খান ফোন করে ব্রিগেডের অবস্থা জানতে চান। তাকে পরিস্থিতি শান্ত বলে জানালে তিনি আমাকে সেনাসদরে চলে আসতে বলেন। বলাবাহুল্য এ ক'দিন আমি ব্রিগেডে একা। মেজর হাফিজ ৭ই নভেম্বর রাত থেকে ১ম বেঙ্গলের সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়নের সাথে ভৈরবের দিকে চলে যান। পরিস্থিতির ভুল বোঝাবুঝির জন্যই ১ম বেঙ্গল সেনানিবাস ত্যাগ করেছিল। আমি বহুকষ্টে সেনাসদরে মিলিটারি অপারেশন পরিদপ্তরে পৌছি।

আমি সেদিনও সারারাত জেগে লেঃ কর্নেল নুরুদ্দীন খানকে সহযোগিতা করতে বিভিন্ন ইউনিটের লোকবল আর পরিস্থিতির খবর নেয়ার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করার প্রয়াস করছিলাম। প্রায় মধ্য রাতে যশোহর সেনানিবাস থেকে লেঃ কর্নেল আব্দুস সালামের নেতৃত্বে (পরে মেজর জেনারেল ও সিজিএস) ১২ই বেঙ্গলের সৈনিকরা ঢাকা সেনানিবাস রক্ষার জন্য এসে পৌছে। তাদের কমান্ডো কোম্পানীকে সেনাসদর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। সকালের দিকে আরও একটি ইনফেনট্রি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় পৌছালে জিয়াউর রহমানের হাত আরও শক্ত হয়। প্রসংগত ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের প্রতিটি ইউনিটই ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পরে মুহ্যমান হয়ে থাকে কেবল মাত্র ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট যারা জিয়াকে মুক্ত করার কৃতিত্বের দাবীদার এবং সঙ্গত কারণে তাদের আধিপত্য বজায় থাকে। প্রসঙ্গত এই ২ ফিল্ড রেজিমেন্টও ১৫ই আগস্টের বিপ্লবে রশীদের নেতৃত্বে যোগ দেয়।

৯ই নভেম্বরের সকালের দিকে বিভিন্ন ইউনিটের খতিয়ান নিতে থাকলে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য ও সৈনিকদের কিছু কিছু খবর আসতে থাকে। তাদের সাথে জেএসডির সম্পর্ক, সমগ্র বাহিনীর মধ্যে নাশকতামূলক তৎপরতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের নীল নক্সারও খবর প্রকাশ পেতে থাকে। এদিকে মীর শওকত আলী সিজিএস হওয়ার পর থেকেই সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে তৎপর করে তোলেন এবং সুচতুরতার সাথে সৈনিকদের বিশৃঙ্খলা কিভাবে দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করতে পারে তার একটা বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হন। তার এ ধরনের প্রচারণা সৈনিকদের অতিদ্রুত সংঘবদ্ধ হতে সহায়তা করে।

প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে লেঃ কর্নেল এ জে এম আমিনুল হক ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে যোগদান করেন। এ কয়দিন আমি একাই ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার সামলাই তখনও অবশ্য রুটিন কাজ তেমন শুরু হয় নি। ভিতরে ভিতরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার প্ররোচনা তখনও চলছে। বিশেষ করে সৈনিকদের ১২ দফা দাবী সরকারী ভাবে গৃহীত হয় নি কারণ এসব দাবীদাওয়ায় সম্মত হতে সরকারের বিবেচনার জন্য কিছুটা সময় লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সময়ের মধ্যেই জেএসডির জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আ স ম আব্দুর রব, মেজর জলিল, হাসানুল হক ইনু প্রমুখ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে সৈনিকদের সাথে ওয়াদা খেলাপ করার দোষারোপ করে বিবৃতি দিতে থাকেন। জিয়াউর

রহমানও জেএসডি কে ৭/৮ই নভেম্বরের অফিসারদের হত্যায় সৈনিকদের প্ররোচিত করার জন্য সরাসরি দায়ী করেন। শুধু তাই নয় তিনি নভেম্বরের মাঝামাঝি আবার রেডিওতে ভাষণ দিয়ে দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দান করেন। এদিকে সমগ্র সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যগণকে সনাক্ত করা শুরু হয় এবং তাদের অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করে জেএসডির অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নাম পাওয়া যায়। স্মরণ থাকে যে, ৭ই নভেম্বরেই জেএসডির অনেক নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে ছাড়া হয়েছিল যার মধ্যে পূর্বোক্ত অনেক নেতাই ছিলেন। এর মধ্যেও বিভিন্ন সেনানিবাসে বিভিন্ন সময়ে লিফলেট বা প্রচারপত্র তাহেরের 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' নামে বিলি করা হয়। বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যগণকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা শুরু হয়। এসব ব্যবস্থার ফলে ধীরে ধীরে জিয়াউর রহমান সৈনিকদের নিজের আয়ত্তে এনে অফিসারদের আস্থা ভাজন হয়ে উঠেন। অতি অল্প সময়ে সমগ্র দেশে তাঁর ভাবমূর্তি গড়ে উঠে যদিও নামমাত্র রাষ্ট্রপতি তখনও একজন আলাদা ব্যক্তি কিন্তু জিয়াই হয়ে উঠেন অঘোষিত রাষ্ট্রপতি। ২৩শে নভেম্বর থেকে জিয়া জেএসডির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে জেএসডির জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আ স ম আব্দুর রব, মেজর জলিল, হাসানুল হক ইনু, ফ্লাইট সারজেন্ট আবু ইউসুফ খান এবং তাহেরের বড়ভাইকে গ্রেফতার করা হয়। তার পরের দিন তাহেরকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রেফতার করা হয়। এদের গ্রেফতারের সাথে আপাত দৃষ্টিতে সিপাহী বিপ্লবের ইতি হয়।

এর দু'দিন পর আবু তাহের এবং অন্যদেরকে ছাড়াবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনকে বন্দী করার এক প্রচেষ্টায় জেএসডির কর্মীরা তার অফিসের তার উপরে হামলা চালায়। হামলার সময় তার দেহ রক্ষীদের গুলীতে চারজন হামলাকারি নিহত হয়। জিয়াউর রহমান এ ঘটনার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সারাদেশে অভিযান চালিয়ে জেএসডি'র প্রায় দশ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এসবের মধ্যে দিয়ে তিনি দিনে দিনে নিজেকে বাংলাদেশের একমাত্র শক্তিশালী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন।

কর্নেল (অবঃ) আবু তাহের, যিনি গণবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য। তার উদ্দেশ্যকে ত্বরান্বিত করে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু। কর্নেল তাহের অত্যন্ত সুচতুর অফিসার ছিলেন যিনি মুক্তিযুদ্ধে একটি পা হারান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত অবস্থায় পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন। আর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপে ভাল করায় তাকে যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট ব্যাগে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ প্রশিক্ষণ, প্যারা জাম্পের রিগারস কোর্সের জন্য মনোনীত করে পাঠালে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ট্রেনিং সম্পন্ন করেন এবং তখন পর্যন্ত তিনিই একমাত্র বাঙালী অফিসার যাকে এ প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল। আগেই বলেছি যে, তিনি তার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার কারণে তাকে বঙ্গবন্ধুর সময়েই সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। অবসর প্রাপ্ত অফিসার হিসেবে বঙ্গবন্ধু বি আই ডাব্লিউ টি সি'র ট্রেজার ইউনিটের কর্মকর্তা হিসেবে পুনঃ নিয়োগ করেছিলেন।

তাহের, জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিল্পবের সূচনা করেন। শোনা যায় যে, তাহেরের বৈপ্লবিক ধ্যান ধারণার সাথে তিনিও একমত পোষণ করতেন এবং দু'জনার মধ্যে এ বিষয়ে একটা যোগাযোগও ছিল। তাহের, জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করে তাঁর (জিয়াউর রহমানের) ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজস্ব পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু জিয়ার বুদ্ধি এবং কৌশলের নিকট তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তাহেরের পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে পরিপক্বতা লাভে সমর্থণ হয় নি। এর কারণেই হয়ত খালেদ মোশারফের ব্যর্থ অভ্যুত্থান যা তাহেরকে বাধ্য করেছিল তড়িঘড়ি করে তার অভ্যুত্থানকে এগিয়ে আনতে। তবে তাহের যে মারাত্মক ভুলটি করেন সেটা হল তিনি বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম হননি। এদেশের জনগণ, সমাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধে যত উদারই হোকনা কেন বাম ঘেঁষা রাজনীতি কখনই বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে আজ অব্দি সক্ষম হয়নি, ভবিষ্যতেও হয়ত হবে না।

তাহের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছিলেন বহুদিন আগে থেকে। আর বাংলাদেশে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যের শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে জিয়াউর রহমানের কাঁধে ভর দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন সেই জিয়াউর রহমানই তাহেরের ফাঁসীর বন্দবস্ত করেন তারই (তাহেরের) অত্যন্ত 'অমানবিক কার্যকলাপের জন্য। ২১শে জুলাই ১৯৭৬ সনে দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাহেরকে ঢাকা জেলের ভিতরেই সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রাইবুনালের রায়ে ফাঁসীর রশিতে প্রাণ দিতে হয়। তাহেরের সাথে অন্যদের মধ্যে প্রায় ৩০ জন

সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদেরকেও বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড দেয়া হয়। এরা সবাই তথাকথিত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য ছিল। তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সাময়ীকভাবে বিনষ্ট হলেও তার রেশ থেকে যায় বহুদিন । ফলে পরবর্তীতে সংগঠিত হয় আরও ২১টি ছোটবড় আকারের সশস্ত্র রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। আর ২১তম অভ্যুত্থানেই ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের প্রখ্যাত সেক্টর কমান্ডার, কালুর ঘাট রেডিও স্টেশন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকারী, স্বাধীনতার ঘোষক বলে পরিচিত, ৭ই নভেম্বরের নায়ক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রাণ হারান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে তাঁরই ঘনিষ্ঠ একজন সহমুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর, বীর উত্তমের পরিচালিত ব্যর্থ অভ্যুত্থানে। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের দশ বছর পর সেই একই শহর চট্ট্রগ্রামে তাকে প্রাণ দিতে হল নির্মম ভাবে।

৭ই নভেম্বরে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সুচতুরভাবে সিপাহী বিপ্লবের সূচনা ঢাকা সেনানিবাস থেকে শুরু করেছিল যা অন্যান্য সেনানিবাসেও একই সময়ে, বিশেষ করে যশোর, কুমিল্লা, বগুড়া ও চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তবে অন্যান্য সেনানিবাসে এর আকার এবং ব্যাপ্তি ঢাকার মত এত প্রকট ছিলনা। এ বিপ্লব সেনাবাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্তন আনে যেমন বহুল প্রচলিত ব্যাটম্যান প্রথা বাদ দিয়ে অফিসার জেসিওদের জন্য ব্যাটম্যান ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সাধারণ সৈনিকদের ভেতর থেকে যোগ্যতানুসারে কিছু 'জেনারেল লিস্ট' অফিসার নিয়োগ করার বিধি প্রবর্তন করা হয়। সাধারণ সৈনিকদের বেতনের সাথে কিছু ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেয়া হয়। ৭ই নভেম্বরকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস নাম করণ করে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

৭ই নভেম্বরের বিপ্লবে আর তার পরবর্তী ঘটনাগুলো জিয়াউর রহমানকে শক্তিশালী হবার সুযোগ করে দেয়। আর তিনি এ সুযোগে সেনাবাহিনীকে সুংসগঠিত করে শুধু সেনাবাহিনীর শক্তিই বৃদ্ধি করেন নি সে সাথে তিনি নিজের অবস্থানকে সেনাবাহিনীর ভেতরে এবং বাইরে সুদৃঢ় করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীক ৫টি ব্রিগেড থেকে ৫টি ডিভিশনে উন্নীত করায় সেনাবাহিনীতে উচ্চ র‍্যাংকে দ্রুত প্রমোশন দেয়া হয়। সেই সাথে সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধিতে সাধারণ সৈনিকদের প্রমোশনের ক্ষেত্রও তৈরী হয়। সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন করা হয়।প্রাক্তন রক্ষীবাহিনীর জোনাল হেডকোয়ার্টারগুলোকে

সেনাছাউনিতে উন্নীত করা হয়। শুধু সেনাবাহিনীই নয় তিনি বিমান ও নৌবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করেন। চীনের সাথে সুসম্পর্কের কারণে চীনের অনুদানের আওতায় সশস্ত্রবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা হয়।

জিয়াউর রহমান সশস্ত্রবাহিনীর ভেতরে তার অবস্থানকে মজবুত করার জন্য সৈনিকদের ধর্মীয় অনুভূতিকেও চতুরতার সাথে কাজে লাগান। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আর পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। এতে তার উদারতা এবং সেনাসদস্যদের মধ্যে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এনে দেয়। তিনি মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে উপ প্রধান হিসেবে বহাল রাখেন এবং পরবর্তীতে তাঁর (জিয়াউর রহমানের) স্থলে সেনা প্রধান নিয়োগ করেন। তিনি প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা প্রশ্নটি কখনই প্রশ্রয় দেন নি।

সেনাবাহিনীতে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের জায়গায় নিজেই রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে 'হ্যাঁ' 'না' ভোটের মাধ্যমে তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়াটাকে বৈধ করার চেষ্টা করেন। তিনি বাংলাদেশের low Political Culture এর সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে সসশ্রবাহিনীর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ করে দেন।

৭ই নভেম্বরের মধ্যে দিয়ে তাহের তার উদ্দেশ্য যেভাবে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন তার ক্ষেত্র বাংলাদেশে তিনি (তাহের) তৈরী করতে সক্ষম হননি। He totally misjudged the mood of the people of Bangladesh regarding acceptance of his brand of socialism in a conservative religious society. তিনি (তাহের) ১৯১৯ সনের ভলসেভিক Revolution এর ধারার ব্যর্থ অনুকরণ করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আর একজন উচ্চাভিলাষী অফিসারের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় চাতুর্যে পরাজিত হন। তিনি জিয়াউর রহমানের অত্যন্ত Calculated খেলার ছকের মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হননি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাহেরের ভাবধারা ছিল অগ্রহণযোগ্য। তাহের হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ কোন নিরিবিচ্ছিন্ন ভূ-খন্ড নয়। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ চরম রাজনৈতিক অব্যবস্থা প্রতিবেশী দেশের কিছু কিছু অংশে যে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে সে কথা তিনি হয়ত ভালভাবে

নিরীক্ষা করে দেখেননি। তিনি ফিদেল ক্যাস্ট্রো হতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাংলাদেশকে কিউবা বা বাংলাদেশে প্রাকবিপ্লব কিউবার পরিস্থিতি প্রস্তুত করতে পারেননি। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাাহিনীর কাঠামোতে যে আমূল পরিবর্তন তিনি আনতে চেয়েছিলেন তার ক্ষেত্র তৈরীতে তিনি ব্যর্থ হন। তবে তিনি যা করতে গিয়েও করতে পারেননি আর তার ফলে বহু সৈনিককে পরবর্তীতে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হয়।

বঙ্গবন্ধুর হত্যা আর রাজনৈতিক অঙ্গনের শূন্যতা ও তাহেরের ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ প্রয়াস সব মিলিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে জিয়াউর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ ছিলনা বললেই চলে বরং তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে অপ্রতিদন্দ্বী থাকাতে আর বিভিন্ন দলে ভাঙ্গনের ফলে দলছুট রাজনৈতিক নেতাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। এদিকে খালেদ মোশারফের মৃত্যুর পর আপাত দৃষ্টিতে তাকে (জিয়া) চ্যালেঞ্জ করার মত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কেউ ছিলনা, যদিও সৈনিক অসন্তোষ ও জিয়াকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র গোপনে চলতে থাকে। তিনি ঢাকাতে ৯ম ডিভিশন সংগঠিত করে মীর শওকত আলীকে জিওসি নিযুক্ত করে ঢাকায় নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করলেন। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার এমএ মঞ্জুরকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর স্থলে সিজিএস নিযুক্ত করেন।

মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর, সিজিএস হওয়ার আগে ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাসে সামরিক এটাচি ছিলেন। তিনি একজন ইনটেলিজেন্ট এবং স্মার্ট অফিসার হিসেবে মেজর থাকা অবস্থাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সার্গোদা পাবলিক স্কুলের একজন মেধাবি ছাত্র ছিলেন। পাকিস্তান স্টাফ কলেজে প্রবেশ পরীক্ষায় মেধা তালিকায় থাকায় তিনি কানাডায় স্টাফ কলেজ করার সুযোগ পান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও কয়েকমাস পর্যন্ত শিয়ালকোটে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্রিগেডের স্টাফ অফিসারের দায়িত্বে থাকার কয়েকদিনের মধ্যে জিয়াউদ্দিন ও তাহেরের সাথে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য তাকে 'বীরউত্তম' খেতাবে ভূষিত করা হয়। ১৯৬০ সনে কমিশন পেয়ে ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সর্ব কনিষ্ট মেজর জেনারেল ও সিজিএস পদে নিযুক্ত হন। স্বভাবতই মঞ্জুর নিজেকে More equal then equals ভাবতেন। তাঁর নিজস্ব প্রভাব আর বিচক্ষণতার ভাবমূর্তি তিনি সুনিপণভাবে নিজস্ব প্রভাব বলয়

সৃষ্টি করার কাজে খাটিয়ে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে যে দুটি ব্যাচ অফিসার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাতে মঞ্জুরের অবদান থাকায় তিনি সহজেই এ দুই ব্যাচের অফিসারদের প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। সিজিএস হিসেবে তিনি জিয়াউর রহমানের অতি নিকটতম ব্যক্তি হয়ে পড়েন। সেনাবাহিনী সম্বন্ধে তার (মঞ্জুর) পরামর্শই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। সেনাবাহিনীতে উপপ্রাধানকেও মঞ্জুর নিজের ছায়ায় রেখে চলতেন। In fact Manzoor never saw eye to eye with DCAS, মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এদিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রথম ডিভিশনের জিওসি হওয়ায় এবং ৭ই নভেম্বর থেকে সার্বক্ষণিক জিয়াউর রহমানের সাথে একযোগে কাজ করায় মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীও সেনাবাহনীর মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। ক্রমে ক্রমে মঞ্জুর আর শওকত আলী সেনাবাহিনীতে নিজস্ব দু'টি বলয় গড়ে তুলতে থাকেন। নিজের অবস্থান অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকায় জিয়াউর রহমান এ সব বুঝেও বিশেষ তোয়াক্কা করতেন না। মঞ্জুর আর শওকত আলীর মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ চলতে থাকে। সিজিএস জিয়াউর রহমানের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ায় এবং দেশে সামরিক শাসনের প্রেক্ষিতে মেজর জেনারেল মঞ্জুর বেসামরিক আমলাদের কাছেও সুপরিচিত হয়ে উঠেন। কার্যত তিনি তখন দেশের প্রধান Policy Maker হয়ে উঠেন। এ কথা তিনি নিজেই এনথনি ম্যাসকারনিহাসকে বলেন যা তিনি তার বইতে সবিস্তারে বর্ণনা করে লিখেছেন।[১]

ইতিমধ্যে কয়েকবার বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সেনানিবাসে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রয়াস চলতে থাকে মধ্যে কয়েকটি সেনা অভ্যুত্থান হয় ফারুক আর রশীদকে কেন্দ্র করে।

ফারুক আর রশীদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরি নিতে অস্বীকার করে লিবিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে তারা বাংলাদেশে একটি ইসলামিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল বলে প্রচার করার ফলে লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মোয়াম্মের গাদ্দাফির সাহায্য সহযোগিতা পেতে থাকে। এ দুজন লিবিয়াতে থাকলেও দেশে সেনাবাহিনীতে তাদের অনুসারিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তারা দুজনেই ভেবেছিল তিনি তাদেরকে দেশে ফিরে আসার সুযোগ দেবেন। কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে সেরকম কোন ইঙ্গিত না পাওয়ায় তারা বিদেশে অস্থির হয়ে উঠে এবং জিয়াউর রহমানকে

---

1. *Bangladesh : A legacy of Blood :*

উৎখাত করার প্ল্যান করতে থাকে। দেশে ফিরে আসার জন্য নানা অজুহাতে সরকারের অনুমতির অপেক্ষায় থাকে। যাই হোক ১৯৭৬ সনের মার্চ মাসের দিকে রশীদকে দেশে আসার অনুমতি দেয়া হয়। সরকার রশীদকে সপরিবারে এবং সাথে ফারুকের স্ত্রীকেও আসতে অনুমতি দেয় কারণ ফারুকের ছেলে-মেয়েরা বাংলাদেশে তার বাবা মার কাছে থেকে গিয়েছিল। তবে সরকার ফারুক বা আর অন্য কাউকে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়নি। রশীদ ফারুকের সাথে জার্মানীর ফ্রাংফোর্টে যোগাযোগ করে তার দেশে যাওয়ার কথা জানায়। রশীদ ঢাকা আসার পূর্বে ফারুকের সাথে লন্ডনেও দেখা করে। তাদের সৌভাগ্য যে, সে সময় এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াবও সরকারী কাজে লন্ডনে ছিলেন। রশীদ আর ফারুক তার সাথে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেয়। ফারুক তওয়াবের কাছ থেকেই জানতে পারে যে, বেঙ্গল ল্যান্সার দুটি ইউনিটে ভাগ হয়ে একটি সাভারে আর একটি বগুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট ঢাকাতেই আছে। লন্ডন থেকে ফারুক ও রশীদ বেনগাজি হয়ে, রশীদের পরিবারের সদস্য ছাড়াই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় আর ফারুক সিঙ্গাপুরে তাদের দলের সুবেদার মোসলেম উদ্দিন, সারাফত আলী আর হাসেমের সাথে মিলিত হয় এবং ঢাকা থেকে রশীদের ডাকের অপেক্ষায় থাকে। রশীদ ঢাকায় পৌছে সেনাসদরের সাথে তাদের বিদেশে আর্থিক সমস্যার কথা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনার আড়ালে অভ্যুত্থানের নীল নকশা তৈরী করতে থাকে। রশীদ ঢাকায় থাকাকালীন সময়ের মধ্যেই ২ ফিল্ড সাভারের এবং বগুড়ার ট্যাংক রেজিমেন্টগুলোকে অভ্যুত্থানের জন্য তৈরী করতে থাকে। ওদিকে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নাকের ডগার উপর দিয়েই রশীদ ফারুককে ঢাকায় আসার জন্য জানায় ফারুক ঢাকা বিমান বন্দরে পৌছলেই সাভার এবং বগুড়ায় সৈনিক বিপ্লব ঘটবে। রশীদের প্রস্তুতির আশ্বাস পেয়ে ফারুক ঢাকায় সদলবলে এসে পৌছে এবং সোজা সাভারে তার পুরানো ইউনিটে গেলে সেখানে তাকে সংবর্ধনা দিয়ে তার পক্ষে ধ্বনি দেয়া হয় । ফারুক ২৫শে এপ্রিল ঢাকায় যে বিমানে আসে কাকতালীয় ভাবে একই বিমানে ডালিম এবং তওয়াব লন্ডন থেকে ঢাকায় পৌছে। এসব ঘটনা সেনাসদরে যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করলেও এদের বিরুদ্ধে কোন কারণবশত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এদিকে ফারুকের ঢাকায় পৌঁছার দুদিন পর অর্থাৎ ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৬ এ বগুড়া এবং সাভারে ট্যাংক রেজিমেন্টগুলোতে বিদ্রোহ শুরু হয়। বগুড়া সেনানিবাসে ট্যাংক রেজিমেন্টের সাথে আরও দু একটি ইউনিট যোগ দেয় এবং তারা ফারুককে ঢাকা থেকে বগুড়ায় পাঠাবার দাবী জানাতে থাকে। যদিও বগুড়া থেকে বের হবার সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয় তবু বগুড়া সেনানিবাসের পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়নি। আমি তখন সৈয়দপুরে আর্টিলারী রেজিমেন্টের অধিনায়ক এবং আমার একটি গান ব্যাটারীও সৈয়দপুর থেকে বগুড়ায় বিদ্রোহ দমনে পাঠানো হয়। জিয়াউর রহমান রক্তপাত এড়াতে বাধ্য হয়ে ফারুককে বগুড়ায় ট্যাংক ইউনিটকে শান্ত করতে পাঠান। তিনি কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন তা বোধগম্য নয়। ফারুক ইউনিফরম পরে বগুড়ায় হাজির হয়ে ট্যাংক রেজিমেন্ট ঢাকায় আনার জন্য সৈনিকদের উত্তেজিত করতে থাকে। ওদিকে ফারুক বগুড়ায় পৌছার সাথে সাথে সাভারে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। রশীদ ঢাকায় এ সুযোগ ব্যবহার করার পূর্বেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও তাকে তার বাড়ীতেই আটক রাখা হয়। ফারুক বগুড়ায় অনড় থাকে। কিন্তু তখন ফারুকের ট্যাংক রেজিমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বেকাদায় পড়ে। রক্তপাত এড়াবার জন্য ফারুকের পিতামাতাকে হেলিকপ্টারে বগুড়ায় নিয়ে এলে তাদের অনুরোধে ফারুক রহমান বগুড়া ত্যাগ করে। ফারুকের এ ধরনের আচরণে সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায় আর নেমে আসে হতাশা। আস্তে আস্তে বগুড়ার পরিস্থিতি জিয়াউর রহমান তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে কিছু সৈনিকদের বিচার করা হয় এবং দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসী ও কারাদন্ড দেয়া হয়। ফারুককেও এ সাথে কারারুদ্ধ করা হয়। এমনিভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে ২৭ এপ্রিলের একটি অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এর কয়েকমাস পরে ১৫ জুলাই ১৯৭৬ সনে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারকে সেনাবাহিনীর ইউনিটের তালিকা হতে বিলুপ্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সনের অভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারী দুটি ইউনিটের একটি এবং নেতৃত্বদানকারী প্রধান ইউনিট।

আরও একটি বড় ধরনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সনে। এ ব্যর্থ রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে বিমান ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ১৯৭৫ সনের সিপাহী বিপ্লবের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এ অভ্যুত্থানেও কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সেনা সংস্থার কিছু সদস্যেদের যোগশাজস পাওয়া যায়। মনে করা হয় জেএসডি এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আর একবার ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা

চালিয়ে ছিল। আর এ প্রচেষ্টায় অনেক বিমানবাহিনীর নিরীহ চৌকস অফিসার প্রাণ হারায়।

এ অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয় ১৯৭৭ সনের ২৮মে। সেপ্টেম্বর রাতে যখন জাপান এয়ার লাইন্সের DC-৪ বিমান টোকিও থেকে ১৫৬ জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই 'হিকাজ কমান্ডো' ইউনিট নামের জাপানী সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক হাইজ্যাক হয়ে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করানো হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম এবং এ ধরনের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করার মত অভিজ্ঞতা ও স্পেশাল ফোর্স এবং যন্ত্রপাতি সব কিছুরই অভাব ছিল। জিয়া সরকার, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এজি মাহমুদকে প্রধান করে বিমানবাহিনীকে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব দেয়। উল্লেখ্য, এর কয়েকমাস পূর্বে জিয়া আর তওয়াবের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে তওয়াবকে বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে অব্যাহতি দিয়ে এ জি মাহমুদকে বিমানবাহিনী প্রধান নিয়োগ করা হয়েছিল। এ হাইজ্যাকিং এর মধ্যস্থতার সাথে ঢাকায় অবস্থানরত অনেক সেনা ও বিমানবাহিনী অফিসার জড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তেজগাঁও বিমানবন্দরেই অবস্থান নেন। বিমানবাহিনী আর সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়ে। যেহেতু এ হাইজ্যাকিং এর মধ্যস্থতা আর ঘটনার বিবরণ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচার করা হচ্ছিল বলে সমস্ত দেশবাসীই টেলিভিশনের পর্দার সামনে ভীড় জমিয়ে ছিল। যখন সমগ্র দেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে এ নাটক প্রত্যক্ষ করছিল আর সে সময়েই বগুড়া সেনানিবাস থেকে শুরু হয় আরেক সিপাহী বিপ্লবের। প্রথমে বেশকিছু অফিসার নিহত হন। এদের একজন লেফট্যানেন্ট হাফিজুর রহমানের লাশ ঢাকায় দাফনের সময় তার বাবা মা আর আত্মীয় স্বজনরা উপস্থিত সৈনিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলে সেখানেই ছোট খাট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যশোর থেকেও সৈনিকদের ভেতরে অসন্তোষ দেখা দেয়ার খবর আসতে থাকলে ঢাকায় সতর্ক অবস্থা নেয়া হয়। এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ৩০ সেপ্টেম্বর রাত দুটোর পর থেকেই শুরু হয় ঢাকা সেনানিবাসে দ্বিতীয় 'সিপাহী বিপ্লব'। বিপ্লবী সৈনিকরা, যার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল বিমানবাহিনীর সদস্য তারা বিমান বন্দরে হামলা করে সেখানে কার্যরত ১১ জন বিমানবাহনী অফিসারকে হত্যা করে। আশ্চার্যজনকভাবে বিমানবাহিনী প্রধান প্রাণে রক্ষা পান। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বিপ্লবী সৈনিকরা রমনায় রেডিও স্টেশন দখল করে স্বিপ্লবী নেতার দেশবাসীর

উদ্দেশ্যে ভাষণের ঘোষণাও দেয় কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সে নেতার আবির্ভাব হয়নি। যা হোক সাভার ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দেয়ার কারণে এ ঘোষণা দেশবাসী পর্যন্ত পৌছেনি। সেদিন এ ঘোষণায় বিমানবাহিনীর জনৈক সার্জেন্ট আফজারকে রাষ্ট্র প্রধান ঘোষণা করা হয়েছিল। এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে মীর শওকত আলীর ৯ম ডিভিশনকে নিয়োগ করা হলে ক্ষীপ্র গতিতে এ অভ্যুত্থান প্রচুর রক্তপাতের বিনিময়ে ব্যর্থ করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে ঝরে যায় অনেক রক্ত, লাল হয়ে যায় বিমান বন্দর এলাকা। নিহত হয় ১১ জন খ্যাতি ও উদীয়মান বিমানবাহিনীর অফিসার। সকালে জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার দায়ে বহু সৈনিককে গ্রেফতার করে সামরিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত বিচার করে অনেককে ফাঁসী দেয়া হয় । এখানে তাদের সঠিক সংখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। আর এ বিদ্রোহীদের হাতে যে ক'জন বিমানবাহিনী অফিসার নিহত হন তারা হলেন গ্রুপ ক্যাপটেন রাস মাসুদ, গ্রুপ ক্যাপটেন আনসার আহমেদ চৌধুরী, উইং কমান্ডার আনওয়ার শেখ, স্কোয়াড্রন লীডার মতিন, ফ্লাইট লেফটেনেন্ট শওকত জান চৌধুরী, সালাউদ্দিন, ফ্লাইং অফিসার মাহবুবুল আলম এবং আখতারুজ্জামান এবং তিনজন পাইলট অফিসার এম এইচ আনসার, নজরুল ইসলাম এবং শরিফুল ইসলাম। আর মোহাম্মদ ইনাম, স্কোয়াড্রন লীডার সিরাজুল হকের ১৬ বৎসরের পুত্রও মারা যায়। এ অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অপুরণীয় ক্ষতি হয় যার ক্ষত এখনও শুকায়নি। এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনীর সিগন্যাল এবং সাপ্লাই কোরের কিছু সংখ্যক সৈনিক ছাড়া আর কোন ইউনিটের সৈনিকরা উল্লেখজনকভাবে যোগদান না করায় ।

এ ঘটনা জিয়াউর রহমানকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। এ ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে বিমানবাহিনীর প্রধান এজি মাহমুদকে পরিবর্তন করে এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীনকে বিমানবাহিনী প্রধান নিয়োগ করা হয়। এ অভ্যুত্থান, এর বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা ও কৃতিত্ব নিয়ে ৯ম ডিভিশনের মীর শওকত আলী এবং সিজিএস মঞ্জুরের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চরম পর্যায়ে পৌছলে জিয়া দুজনকেই ঢাকার বাইরে, মীর শওকত আলীকে যশোরে ডিভিশন কমান্ডার আর মঞ্জুরকে ২৪ পদাতিক ডিভিশন চট্টগ্রামে বদলি করে ঢাকার ক্ষমতা বলয় থেকে সরিয়ে দেন। মীর শওকত আলী এ বদলীর আদেশ গ্রহণ করলেও মঞ্জুর এ ব্যবস্থায় খুশি হতে পারেননি।

নয়

১৯৭৯ সন। আমি মীরপুর স্টাফ কলেজ সম্পন্ন করে সেনাসদরে মিলিটারী অপারেশন ডাইরেক্টরটে জিএসও-১ (লেঃ কর্নেল পদবীর) পদে নিযুক্ত হই। তখন জিয়াউর রহমান নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সেনাপ্রধান, মেজর জেনারেল মান্নাফ সিজিএস। অবশ্য কয়েক মাস পরে মান্নাফ কুমিল্লা বদলী হলে মেজর জেনারেল নুরুদ্দীন খান সিজিএস হয়ে আসেন। আর ডিএমও ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আব্দুল ওয়াহেদ (পরে মেজর জেনারেল, অবসর প্রাপ্ত)। ১৯৭৫ সনের পরে আমি দ্বিতীয় বারের মত ঢাকায় চাকুরি করার সুযোগ পেলাম। মাসে প্রায় একবার করে জিয়াউর রহমান এমও ডাইরেক্টরেটে অপারেশনাল ব্রিফিং এ আসতেন। সেনাসদরে থাকার সুবাদে প্রায় সব সিনিয়র অফিসারদের সাথেই পুনঃ পুনঃ দেখা হত। তখন জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে এবং সেনাবাহিনীতে তাঁর ছিল অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান। তাঁর দল বিএনপি ক্ষমতার শিখরে। বিএনপি গড়া হয় বিভিন্ন দল ছুট নেতা আর কিছু সংখ্যক অবসর প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে। বিএনপি গড়ার পিছনেও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সংস্থার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর সমগ্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে একজন পিএসও এর নিচে সেনানিবাসে সেনাসদরের কাছেই একটি ছোট অফিস স্থাপন করেন যেটা বেগম খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সশস্ত্র বিভাগ কার্যালয় নামে পরিচিত। জিয়াউর রহমান এ অফিস সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁর কর্তৃত্ব বহাল এবং যোগসূত্র রাখার জন্য স্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও নিজের হাতে রেখেছিলেন। তাঁর পরে এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে এ অফিস শুধু ব্যবহারই করেননি বরং এর মাধ্যমে তিনি সমগ্র সশস্ত্রবাহিনীকে তার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য একে আরও শক্তিশালী করে প্রতিরক্ষা সচিবালয়কে এক রকম নিষ্ক্রিয় করে দেন। এরশাদ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এখনও বলবৎ আছে। এ ছাড়া জিয়াউর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় প্রতিটি বড় অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি থাকতেন। এমন কি প্রতি বছর সশস্ত্রবাহিনীর মহড়াগুলোতে প্রতিটি ফরমেশনে নিজে উপস্থিত থাকতেন। আর এসব অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক মন্ত্রীদের নিয়ে আসতেন। এসব করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী। প্রথমতঃ তিনি সশস্ত্রবাহিনীতে তাঁর প্রভাব কোন ভাবেই কমতে দেননি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর পার্টি (বি এন পি) এবং মন্ত্রিসভাকে পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনীতে তাঁর কর্তৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে জনতাই ক্ষমতার উৎস বললেও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীই তাঁর ক্ষমতার উৎস হয়ে থাকে। একই ভাবধারা এরশাদের নয় বছর শাসন আমলেও বলবত থেকে যায়। অবশ্য এরশাদ এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমান থেকে আরও একধাপ এগিয়ে থাকেন। তিনি (এরশাদ) রাজনৈতিক মিটিংগুলোতেও সেনাবাহিনীর এরিয়া কমান্ডারদেরকে সাথে হাজির রাখতেন। তাঁর সময়েই তৈরী হয় রাষ্ট্রপতির স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স যদিও তিনি ন্যূনতম সিকিউরিটি নিয়ে জনগণের সাথে মেলামেশা করতেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বোধহয় সমসাময়িক সময়ের তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র নেতা যিনি সব চেয়ে বেশী বিদেশ সফরে থাকতেন। তাঁর সময়েই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং মুসলিম বিশ্বের অতি নিকটে চলে আসে। পাকিস্তানের জিয়াউল হক আর সেনেগালের আহমেদ সেকুতরের অতি নিকটস্থ মানুষ হয়ে উঠেন। তিনি ইয়াসের আরাফাতের সাথেও ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলেন। জিয়াউর রহমান এবং মঞ্জুরের পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবর্তীত নীতির ফলে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকে এ অযুহাতে মঞ্জুর শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ডিভিশনের শক্তি আরও বৃদ্ধি করতে থাকেন। Counter Insurgency commander হিসেবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে জড়িত সকল সিভিল আর্মড ফোর্সেস, বেসামরিক প্রশাসনের উপরও কর্তৃত্বের অধিকার অর্জন করেন। কার্যত সেনাসদরে এমও ডাইরেক্টরেট সব ধরনের সামরিক অভিযান প্ল্যান ও পরিচালনা করার কথা থাকলেও এ ডাইরেক্টরেট পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে শুধুমাত্র কো-অর্ডিনেটর হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিযানের ব্যাপারে মঞ্জুর সরাসরিই সরকার এবং বেসামরিক প্রধানদের সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। অনেক সময় সেনাসদরও মঞ্জুরের কার্যক্রমের ব্যাপারে এক রকম অজ্ঞই থাকত। মঞ্জুরকে এ ধরনের শক্তি যোগাবার পেছনে অনেক আমলাও তাকে মদদ যোগাতে থাকে।

যখনই রাষ্ট্রপতি বিদেশে থাকতেন তখনই সব সময়ের জন্য সেনাসদরে এমও এবং এমআই ডাইরেক্টরেটে একজন করে ডিউটি অফিসার মোতায়েন থাকত। এমনিতেই সেনাসদরে প্রতিদিনই একজন করে ডিউটি অফিসার নিযুক্ত থাকে।

১৯৮০ সনের ১৬-১৭ই জুনের রাতে হঠাৎ করে এমও ডাইরেক্টরেটের সকল অফিসারের ডাক পড়ে। অফিসে এসে দেখলাম ডিএমও অনেক আগেই অফিসে হাজির হয়ে সিজিএস এর সাথে জরুরী মিটিং-এ আছেন। সেখানে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্মকর্তারা ছাড়াও ঢাকায় ব্রিগেড কমান্ডারগণও উপস্থিত রয়েছেন। আমি ধারণা করলাম আবার হয়ত কিছু ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের বাইরে। রাত প্রায় এগারোটা হবে তখন খবর এল মিরপুরের একটি আর্টিলারী, ঢাকার একটি এন্টি এয়ারক্রাফট ও সাভারের একটি ইউনিটে কিছু সংখ্যক সৈনিক তৃতীয় বারের মত 'সিপাহী বিপ্লব' ঘটাবার উদ্দেশ্য 'আরমরি' (কোত) ভাঙ্গার প্রচেষ্টায় গ্রেফতার হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক সিপাহী পালাতে সক্ষম হয়। এতে গুটি কয়েক চাকুরিরত অফিসার জেএসডির আর্ম ক্যাডার আর ১৫ই আগস্ট বিপ্লবে জড়িত কিছু অফিসারের যোগসাজশ পাওয়া যায়। এর প্রধান হোতা হিসেবে একজন মুক্তিযোদ্ধা আর্টিলারী অফিসার লেঃ কর্নেল দিদারুল আলমকে সনাক্ত করা হয়। লেঃ কর্নেল দিদারুল আলমের নেতৃত্বে এ অভ্যুত্থান পরিকল্পনা করা হয় কিন্তু তাকে অভ্যুত্থানের নির্ধারিত তারিখের সন্ধ্যা থেকে পাওয়া যায়নি এবং তাকে গ্রেফতার করাও সম্ভব হয়নি। তদন্তের পর অবশ্য আরও একজন চাকুরিরত মুক্তিযোদ্ধা অফিসার লেঃ কর্নেল নুরুন্নবী খান, যিনি বগুড়ায় ডিভিশন হেড কোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন, তারও যোগসাজশ থাকায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। আরও গ্রেফতার করা হয় জাসদের দুজন সদস্য, ছাত্র নেতা মুনির হোসেন আর ব্যাংকে শিক্ষাণবীশ অফিসার মোশারফ হোসেনকে এ ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে। এসব গ্রেফতার অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে দু' একদিনের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয় এবং সমস্ত সেনানিবাসগুলোতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ অভ্যুত্থান ছিল জাসদ এবং বামপন্থী গুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর জিয়া সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের আর এক প্রচেষ্টা। কিন্তু এবার সেনাসদরের সময় মত হস্তক্ষেপে এ প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সাধারণ সৈনিকদের আলাদাভাবে সাভারে কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেয়া হয়। আর যেহেতু প্রধান আস-

ামী দিদারুল আলমকে গ্রেফতার করা যায় নি বলে অফিসারদের কোর্ট মার্শালে বিলম্ব হয়।

১৯৮১ সনের জানুয়ারীর দিকে আমাকে ডি এম ও জানালেন যে, ১৭ই জুন ১৯৮০ সনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের হোতা অফিসারদের কোর্ট মার্শালে আমাকে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে সরকারী কৌশলী নিয়োগ করা হয়েছে। আমার জন্য এ এক বিষন্ন অভিজ্ঞতা মনে করে আমি ডি এম ও, ব্রিগেডিয়ার ওয়াহেদকে আমাকে নিয়োগ না করার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি জানালেন যে, এ ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ নেই কারণ ডিজি এফ আই থেকে সেনাসদরে আমার নাম পাঠানো হয়েছে। সেনাবাহিনীতে ওজর আপত্তির কোন সুযোগ নেই বিধায় অগত্যা আমাকে এ অপ্রিয় কাজ হাতে নিতে হল। এ ধরনের একটি জটিল মামলার সরকারী কৌশলী হওয়া, বিশেষ করে আইনের সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। তা ছাড়া এ অভিজ্ঞতাও খুব সুখকর হবে না কারণ একজন অফিসার হয়ে নিজেদের সংস্থার অন্য অতি পরিচিত অফিসারদের সরকার উৎখাতের মত গুরুতর মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে গুরুতর শাস্তির জন্য ওকালতী করা আমার জন্য মোটেই সুখকর হবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের মামলায় অতি উৎসাহী হয়ে অথবা মামলাকে শক্ত করার জন্য Stock witness ও তৈরী করা বা এক Witness কে দিয়ে সবাইকে Implicate করার যে প্রবণতা থাকে সেটা আমার দ্বারা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। এ কথা আমি কেসের প্রথম ব্রিফিংয়ে বিবাদী পক্ষকে পরিষ্কার ভাবে জানাই। যা হোক নিজের নীতির উপরে দৃঢ় থেকে কেস পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কেস ব্রিফিংয়ে জন্য ডিজিএফআই এর সাথে যোগাযোগ করলাম। সেখান থেকে প্রাথমিক তথ্যে জানতে পারলাম কয়েকদিন পূর্বে দিদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কেসের পুনঃ তদন্ত সমাপ্ত করে কোর্ট মার্শালের অর্ডার দেয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক চার্জসীট তেরী করে তাদের ডিফেন্সের জন্য আইন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাদের সকলের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয় যার সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাণ দন্ড পর্যন্ত হতে পারে। ডিজি এফআই এর ব্রিফিংয়ে পর আমি লেঃ কর্নেল আনিস (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) এর সাথে দেখা করে এর পূর্বে অনুষ্ঠিত এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সৈনিকদের কোর্ট মার্শালের বিবরণ নিয়ে সম্যক ধারণা নিয়েছি। আনিস ঐ কোর্ট

মার্শালের সরকারী কৌশলী ছিল। এর পরে ডিজিএফআই এর তরফ থেকে কেসের এবং ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পটভূমির সম্পূর্ণ ব্রিফিং পাই।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণে প্রকাশ পায় যে, ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানে জড়িত অফিসাররা, যারা বিদেশে আছে তাদের প্ররোচনায় এ অভ্যুত্থানের নীলনকশা তৈরী করা হয়। অনেকটা কর্নেল তাহেরের সিপাহী বিপ্লবের অনুকরণে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে পুনঃ গঠিত করে। তবে এর সাথে তারা একটি রাজনৈতিক পার্টিরও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য বিশেষত বাম ঘেঁষা পার্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে জেএসডির আর্ম ক্যাডারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এতে যাদের নাম জড়িত হয় তাদের মধ্যে ডালিম, পাশা, হুদা, নুর, রশীদ এবং পরে ফারুকের নামও পাওয়া যায়। একমাত্র রশীদ আর ফারুক ছাড়া বাকী সবাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদেশের দূতাবাসে চাকুরিরত বিধায় তদন্তের পর তাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালে একমাত্র লেঃ কর্নেল (অবঃ) আব্দুল আজিজ পাশা ছাড়া আর কেউ আসে নি। পাশা দেশে ফেরার সাথে সাথেই অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৯ সনের মে মাসের প্রচন্ড গরমের মধ্যে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মেজর (অবঃ) বজলুল হুদার বাসায় সুদূর অঙ্কারা থেকে তার ভগ্নিপতি অতিথি হয়ে আসে। এ অতিথি আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব লেঃ কর্নেল (অবঃ) আব্দুল আজিজ পাশা। এর কয়েকদিন পর হুদা আর একজন অতিথিকে স্বাগত জানায় আর এবারের অতিথি সুদূর চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকুরিরত লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম। ডালিম তাদেরকে রশীদ আর ফারুকের আগমনের কথাও জানায় কিন্তু তারা সময়মত পৌঁছেনি বলে এ তিনজনই একমত হয় যে দেশে ফিরে গিয়ে তারা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবে। তবে তারা এ আলোচনাও করে যে, রাজনৈতিক পার্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া সহজ হবেনা। আরও একমত হয় যে, বাংলাদেশে বামঘেঁষা রাজনীতিকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তারা একটি বামঘেঁষা রাজনৈতিক দল গঠন করবে তবে এ দলের দুটি শাখা থাকবে। এর প্রথমটি হবে খোলামেলা রাজনীতির আর এক শাখা হবে গোপন সশস্ত্র সংগঠন যার কার্যক্ষেত্র সশস্ত্র বাহিনীতে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সশস্ত্রবাহিনী হতে সদস্য সংগ্রহ আর সমন্বয় করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যম পর্যায়ের র‍্যাংকের একজন অফিসারকে প্রাথমিক ভাবে

াত্ব দেয়া হবে। রাজনৈতিক শাখা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের
াপাশি গোপন সংগঠনের তৎপরতার উপরেও প্রভাব আর কর্তৃত্ব খাটাবে।
সুযোগমত সামরিক আভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাম ঘেঁষা সরকার গঠন করা
। যেহেতু বিশুদ্ধ বামপন্থী সরকার বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য
না বিধায় ইসলামিক ভাবধারার সমন্বয় করে 'ইসলামিক স্যোসালিজম'-এর
র্তন করা হবে বলে সাব্যস্ত করা হয়। প্ল্যানটি অতি সাধারণ এবং সুদূর প্রসারি,
জই একে কার্যকরি করতে হলে প্রয়োজন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অঙ্গন ছাড়াও
াসদস্য সংগ্রহ করা আর সে সাথে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগাড় করা। ডালিম
পর্যায়ে পাশা আর হুদাকে আশ্বাস দেয় যে, অর্থের কোন অভাব হবে না,
াজনীয় ব্যবস্থা করা হবে, Money is no problem, this will come.
ডালিম পাকিস্তানে তার মিটিং শেষ করে তেহরানে মেজর (অবঃ) নুর এর
থ তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে যায়। তেহরানের বৈপ্লবিক
বেশে ডালিম, নুরকে তার পরিকল্পনা বুঝিয়ে বললে নুর তাতে সম্মত হয়।
কিছু দিনের মধ্যে ডালিম এবং পাশা ছুটি নিয়ে দেশে আসে। এবার তাদের
াযোগের পালা এবং সে উদ্দেশ্যেই ডালিম সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর
থ আর পাশা ভার নেয় সেনাবাহিনীর ভেতরে সমমনা অফিসার নির্বাচন
র। পাশা এমন একজন মাঝারি র‍্যাংকের অফিসারের খোঁজ করতে থাকে যে
াবাহিনী সংগঠনের দায়িত্ব নেবে আর প্রয়োজনবোধে নেতৃত্বও দিতে পারবে।
া ঢাকায় দিদারুল আলম আর উত্তর বঙ্গে কর্মরত লেঃ কর্নেল নুরুন্নবীকে
দর (ডালিম গং) পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানালে দিদার এবং নুরুন্নবী দুজনেই
া দিতে এবং সেনাবাহিনীতে সেনা সংগঠনের কাজ আরম্ভ করার দায়িত্ব নিতে
ত হয়। পাশা, দিদার এবং নুরুন্নবীকে দুজন জে এসডির কর্মীর সাথে পরিচয়
য়ে দেয়া হয়। এদের একজন জগন্নাথ কলেজের বামপন্থী ছাত্র নেতা মুনির
সেন আর একজন কৃষি ব্যাংকের শিক্ষাণবীশ অফিসার মোশারফ হোসেন।
কে ডালিম তার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে সর্বহারা পার্টির কর্নেল
াউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করে তাদের ডালিম সহ পরিকল্পনা সম্বন্ধে
ায়ে তার (জিয়াউদ্দিনের) সহযোগিতা কামনা করে কিন্তু জিয়াউদ্দিন, ডালিম
অন্যদের বিশ্বাস করতে পারলেন না শুধু তাই নয় হঠাৎ তাদের বাম প্রীতিও
াহের চোখে দেখলেন। জিয়াউদ্দিন ডালিমের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখান না
সর্বহারা পার্টি এ কাজের জন্য সুসংগঠিত নয় বলে এড়িয়ে যান। ডালিম

তার প্রচেষ্টায় অনেক বামপন্থী নেতাদের সাথে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আলোচন করে এবং সৈনিক সংগঠনের কথা উহ্য রাখে।

ডালিম এবং পাশা ঢাকায় প্রাথমিক পর্যায় কাজ সেরে সংগঠনের কাজ চালাবার জন্য কিছু নগদ অর্থ দিয়ে যায় আরও আশ্বাস দেয় যে প্রয়োজনীয় অর্থে অভাব হবে না। তবে নিত্য খরচের জন্য দুটি বাস ক্রয় করে উপার্জিত অর্থ থেকে আনুষাঙ্গিক খরচ মেটাবার পরিকল্পনা নেয়। যেহেতু প্রচুর প্রচারপত্র প্রয়োজ তাই আপাতত ছাপাখানা স্থাপন না করা পর্যন্ত হাতে লিখে মোশারফের মাধ্যমে কৃষি ব্যাংকের সাইক্লোস্টাইল মেশিন ব্যবহার করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এস লিফলেট প্রচার করা হবে আর সেনাবাহিনীতে প্রচারের দায়িত্ব নেবে দিদার পরিকল্পনা মোতাবেক বেশকিছু লিফলেট বিতরণও করা হয়।

দিদারও সংগঠনের কাজে লেগে যায়। কিছু পুরানো সহযোদ্ধা সৈনিকদে সাথে যোগাযোগ শুরু করে কিছু কিছু ইউনিটে 'সৈনিক সংস্থা' সংগঠনের প্রচেষ্ট করতে থাকে। একজন এনসিও ক্লার্ককে সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ করা দায়িত্বে নিয়োজিত করে। এই প্রক্রিয়ায় ঢাকায় অবস্থানরত দুটি আর্টিলারী ইউনি নট আর সাভারে একটি ইনফেনট্রি ইউনিট হতে কিছু সদস্য যোগাড় করে নুরুন্নবীও অনুরূপ ভাবে বগুড়া আর যশোরে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তবে সে দিদারের মত অত বেশী কৃতকার্য হতে পারে না। দিদারের পক্ষে সংগঠনের কাজ চালানো একটু সহজ হয় কারণ সে সেনানিবাস সংলগ্ন পুরাতন ডিওএইচ এস এ থাকত, সে সুবাদে তার বাসায় মোটামুটি অগোচরে আনাগোনা করা যেত। তা বাসাতেই ছোট খাট মিটিং হত।

১৯৭৯ সনের শেষের দিকে আঙ্কারাতে আর একটি বৈঠক হয় সেখানে রশীদ সহ পাশা, নুর, হুদা একত্র হয়ে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বিশেষ করে অর্থ সংকুলানের বিষয়টি এ মিটিংএ প্রাধান্য পায়। এ বৈঠকে ডালিম আর শাহরিয়ারের যোগদানের কথা থাকলেও ছুটি না পাওয়াতে তারা আঙ্কারা বৈঠকে যোগদান করতে পারেনি। ফারুক তখন দেশে জেলে থাকায় তার পক্ষেও বৈঠকে আসা সম্ভব হয়নি। এ বৈঠকে আসার সময় রশী লিবিয়া থেকে তথাকথিত এক ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে আসে এবং সেখানে সাময়িকভাবে ঢাকায় অর্থযোগানের প্রতিশ্রুতি দেয়। একইভাবে এ কথা ঢাকায় দিদারকে জানানো হয়। এ বৈঠকের সমস্ত খবরা খবর জাপানে শাহরিয়ারকে জানানো হয়। আশ্চার্যজনক যে, এসব খবরা খবর যথারীতি দূতাবাসে

ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রদূতদের নাকের ডগার উপর দিয়েই আদান প্রদান চলতে থাকে। কখনও কখনও সাংকেতিক মাধ্যমও ব্যবহার করা হত বলে বিশেষ বিশেষ সংবাদ গোপন থাকে। এর মধ্যে আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অবঃ) এফ আর এল মামুন এ ষড়যন্ত্রের কিছুটা অন-মান করতে পেরে ঢাকায় জানালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাকে এ সব ঘটনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য গোপনে নির্দেশ দিলেও পাশা তা জানতে পারে। এ নিয়ে পাশা আর রাষ্ট্রদূতের মধ্যে প্রচন্ড বাকবিতন্ড এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতিও হয় যদিও পাশা তার জবান বন্দীতে একথা অস্বীকার করে।

১৯৮০ সনের মে মাসে আর একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ডালিম, পাশা, হুদা, নুর আর সদ্য জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ফারুক রহমান উপস্থিত ছিল। এ মিটিং এ সাংগঠনিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। যেহেতু এ মিটিং ঢাকায় হয় কাজেই সেখানে দিদারও উপস্থিত ছিল। অর্থাভাব, সাংগঠনিক তৎপরতার সমস্যা, বিশেষ করে সৈনিক সদস্যদের ক্রমাগত অসন্তোষ ইত্যাদির জন্য দিদার যথেষ্ট হতাশাগ্রস্থ হয়ে উঠে এবং জুনের মধ্যে একটি অভ্যুত্থানে যাওয়ার জন্য মতামত দেয়। দিদারের উদ্বেগের আরও একটি কারণ ছিল তা হলো সেনা গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা। তবে তখন সে জানতনা যে, তার নির্বাচিত সৈনিক সংস্থার মধ্যে গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্যও যোগ দিয়ে প্রতিদিনের খবরা খবর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে থাকে। সেনা সদরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে সঠিক দিন ও সময়ের জন্য। স্বীকার করতেই হবে যে, এই প্রথম সেনা গোয়েন্দাদের তৎপরতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় পর্যায়ে পৌছে। যখন একদিকে অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র তৈরীতে সংশ্লিষ্ট অফিসাররা পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিল ঠিক তেমনি অন্যদিকে সেনা কর্তৃপক্ষও তৈরী হচ্ছিল প্রমাণসহ সবাইকে গ্রেফতার করার জন্য। দিদারের সাথে বৈঠকের পরে বিদেশ থেকে আগত অফিসাররা পর্যায়ক্রমে জেএসডি'র একাধিক নেতার সাথে বৈঠক করে। এসব বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, 'সিপাহী বিপ্লব' ঘটিয়ে জিয়াউর রহমান এবং সেনাপ্রধান এরশাদকে হত্যার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা হবে।

এদিকে দিদারের সংগঠিত সৈনিক সংস্থার সদস্য বৃন্দের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা সত্তর অভ্যুত্থন না ঘটালে সমূহ বিপদে পড়তে হবে তা

বুঝতে পেরেই দিদারকে অভ্যুত্থানের জন্য ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল। সৈনিক সংস্থার এসব সদস্যরা দিদারের সাথে অন্য আরও অফিসার জড়িত আছে সেটা জানত না বিধায় তারা দিদারের নেতৃত্বই মেনে নেয়। দিদার চাপের মুখে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় সময় সে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে দেশ চালাবার মত প্রজ্ঞা তার নেই কিন্তু তাতে সৈনিকরা দমে না বরং তাদের মতামত দিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে লাইবেরীয়ায় যদি একজন সার্জেন্ট দেশ চালাতে পারে তবে দিদার একজন মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কর্নেল হয়ে তার পক্ষে বাংলাদেশ চালানো সম্ভব হবে না কেন। এ অকাট্য যুক্তির সামনে তার কোন কথাই ধোপে টেকে না। দিদার না বুঝে যে আগুনে হাত দিয়েছিল সেখান থেকে তার ফেরার পথ যে বন্ধ সেটা সে আগে উপলব্ধি করতে পারেনি। অপরদিকে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা বাড়ায় বিপ্লবী সংস্থার সৈনিকরা ২৬শে মে চেয়ার‍্যান বাড়ীস্থ কাকলী রেস্টুরেন্টে এক গোপন সভায় মিলিত হয়ে ১৭ই জুন বিপ্লবের দিন ধার্য করে। আর এ বিপ্লব ঢাকা সেনানিবাস থেকে শুরু করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ওদিকে নুরুন্নবী দিদারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

১৭ই জুন রাতে বিপ্লবী সৈনিকগণ একদিকে কোত ভেঙ্গে হাতিয়ার বার করার জন্য যখন তৈরী হচ্ছিল তখন অপরদিকে সেনাসদরও তৈরী হচ্ছিল অভ্যুত্থানকারীদের হাতেনাতে গ্রেফতার করার জন্য। সন্ধ্যার পর যখন বিপ্লবী সৈনিকরা দিদারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে তার কয়েক ঘন্টা আগেই দিদার তার বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ঢাকা সেনানিবাসে আর সাভারে বিপ্লবের সূচনা হতে চলেছে। সেনাসদরও ঠিক এ সময়ের অপেক্ষায় ছিল। ঝটিকা অভিযানে প্রায় সমস্ত সদস্যদের গ্রেফতার করা হয় আর দিদার নিরুদ্দেশ হওয়াতে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। সেনাসদরের সময়মত হস্তক্ষেপে এ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। লেঃ কর্নেল দিদার অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়ে নভেম্বরে গোপনে দেশে ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার হয়। লক্ষণীয় যে তার দুদিন আগেই রাষ্ট্রপতি জিয়া দেশের বাইরে আলকুদ কমিটিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

অভ্যুত্থানে জড়িত থাকা অপনাধে গ্রেফতারকৃতে পাশার বিরুদ্ধে চার্জ সিট তৈরী করা হয়। সে খুবই নরম এবং দুর্বলচিত্তের অফিসার। কাজেই তাকে

কিছুটা স্নায়ু চাপে রাখার পর সে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করে সরকারী সাক্ষী হতে রাজি হলে তার সাথে আমি দেখা করি এবং সম্পূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করি। আর কাজী মুনির হোসেন স্বেচ্ছায় রাজসাক্ষী হিসেবে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাকেও রাজসাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কাজী মুনির হোসেন বামপন্থী ছাত্র নেতা এবং জেএসডি'র সদস্য ছিল। মুনিরই রাজনৈতিক দল ও সৈনিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় লিফলেট বিলি করার দায়িত্বও তাকে দেয়া হয়েছিল।

১৯৮১ সনের ১০ই মার্চ অফিসারদের কোর্ট মার্শাল শুরু হলে পাঁচজন অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জন রাজসাক্ষী হওয়ায় শুধুমাত্র দিদারুল আলম, নুরুন্নবী খান আর মোশারফ হোসেনকে অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার দায়ে চার্জসীট দেয়া হয়। লেঃ কর্নেল পাশা এবং মুনির হোসেনকে রাজসাক্ষী হিসেবে কোর্ট গ্রহণ করে। কয়েকমাস কোর্ট চলার পর তিনজনকেই দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেয়। এর মধ্যে দিদারুল আলমকে ১০ বছর, নুরুন্নবী খানকে ১ বছর এবং মোশারফ হোসেনকে ২ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। যদিও আমার তরফ থেকে সেনা আইনের আওতায় প্রথমত সর্বোচ্চ শাস্তি দাবী করা হয়েছিল। রাজসাক্ষী হওয়ায় পাশাকে চাকুরিতে পুর্নবহাল আর মুনির হোসেনকে সসম্মানে মুক্তি দেয়া হয়। কোর্টের রায়ে বাকি যারা অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত অথচ দেশে ফিরে নি তাদের জন্য সরকারকে কার্যকরি ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু আমার জানামতে কোন অজ্ঞাত কারণে এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয় নি। স্মরণযোগ্য যে, এসব অফিসাররাই ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত এবং ৩রা নভেম্বরের পরে দেশ ছাড়ে।

এ মামলা পরিচালনাকালে আমাকে সাহায্য করেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল মোয়াজ্জেম হোসেন এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে এদেশের প্রখ্যাত তিনজন আইনজীবীদের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আমি অকপটে বলতে চাই আইনের উপরে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল আর অভিজ্ঞতা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাঁদেরও এ ধরনের কেসে (সামরিক কোর্টে) কৌশলীর কাজ করায় তাদেরও অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রচুর। এ তিনজন কৌশলী হলেন দিদারের ডিফেন্স কাউন্সিল ব্যারিস্টার সিরাজুল ইসলাম (যিনি এরশাদের প্রথম মামলায় কৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন), নুরুন্নবী খানের ডিফেন্সে ছিলেন ব্যারিস্টার আমিনুল হক (পরে বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল) ও মোশারফ হোসেনের ডিফেন্সে ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন ভাষা সৈনিক এডভোকেট গাজীউল হক।

এ কোর্ট মার্শাল প্রথমে রুদ্ধদ্বারে হলেও পরবর্তীতে এর সম্পূর্ণ বিবরণ সাপ্তাহিক 'হলিডে'তে ছাপা হতে থাকে।

এ মামলা পরিচালনাকালে এবং পরে এ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আমার মনে হচ্ছিল এ ধরনের অপরিপক্ক কাজ কি করে ফারুক, রশীদ এবং ডালিমের দ্বারা পরিকল্পনা করা হয়। তারা এ ধরনের কাজে দিদারুল আলমের মত এমন একজন অফিসারকে কিভাবে বেছে নিয়ে অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দিল যার (দিদার) সেনাবাহিনীতে কোন প্রভাবই ছিল না। আর তা ছাড়া ১৯৭৫ সনে তাদের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল সে ধরনের কিছু ১৯৮০ সনেও নির্দ্বিধায় ঘটবে সেটাই বা তারা কিভাবে মনে করতে পেরেছিল। কারণ ১৯৭৫ সনের সেনাবাহিনী আর ১৯৮০ সনের সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল প্রচুর তফাৎ ।

১৯৮০ সনে সেনাবাহিনী ১৯৭৫ সনের তুলনায় শুধু কলেবরেই বৃদ্ধি পায়নি, সেনাবাহিনী হয়েছিল আরও সুসংগঠিত। যে সমস্ত অফিসার তখন ইউনিট, ব্রিগেড, ডিভিশন এবং সেনাসদরে নিয়োজিত ছিলেন তারা ১৯৭৫ সনের তুলনায় আরও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও ছিল আরও সুসংগঠিত ও কর্ম তৎপর।

উর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কাটারের সাথে।

শকালে ছাত্রদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

দশ

১৯৮১ সনের মে মাসে আমি সেনাসদরে ইন্টারভিউর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের Fort leaven worth এ স্টাফ কলেজের জন্য নির্বাচিত হই। ১৪ই জুন থেকে কোর্স শুরু হবে বিধায় আমাকে ১২ই জুনের মধ্যে Fort leaven worth এ পৌঁছার কথা। Fort leaven worth বিশ্বের অন্যতম সেরা স্টাফ কলেজ। বাংলাদেশ স্টাফ কলেজের রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে এ কোর্সের জন্য সেলেকশন হয়। আমার সাথে ইন্টারভিউতে অন্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম ডিভিশনের জিএস ও-১ লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান, যিনি আর কয়েকদিন পরেই জড়িত হয়ে পড়বে এক অভ্যুত্থানে, পরে সে লেঃ কর্নেল মাহবুবের সাথে মারা যায়। মতিউর রহমানকে আমি প্রথমে যশোরে দেখি। চাকুরিতে আমার জুনিয়র ছিল তবে একজন কর্মঠ ও ভাল অফিসার এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেনাবাহিনীতে সুপরিচিত ছিল। আমার সাথে যখন প্রথম সাক্ষাত হয় তখন সে যশোরে একটি সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনস্ট্রাক্টর ছিল। সব সময় হাসি খুশি আর একটু কেয়ার ফ্রি জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল কিন্তু ইন্টারভিউয়ের সময় তাকে বেশ কিছুটা উত্তেজিত আর অন্যমনস্ক দেখলাম। পরে জানতে পারি ইন্টারভিউ শেষ হবার পর প্রায় দুদিন ঢাকায় ছুটি কাটিয়ে সে চট্টগ্রামে ফিরে যায়। ঢাকায় থাকাকালীন সময়ে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির পিএস কর্নেল মাহফুজ (পরে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে জড়িত থাকায় ফাঁসী হয়) এবং এমএসপি মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমানের সাথেও দেখা করে।

আমি যুক্তরাষ্ট্রে স্টাফ কলেজের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশুনা শুরু করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। আমার বেশির ভাগ সময়ই কাটত সামরিক গ্রন্থাগারে অথবা সেনাসদরের প্রশিক্ষণ ডাইরেক্টরটের রেফারেন্স লাইব্রেরীতে। এ সমস্ত প্রস্তুতি বিশেষ করে বাসায় কিছু প্রস্তুতিমূলক পড়াশুনার কারণে রাতে ঘুমোতে একটু দেরীই হত।

সেদিনও বেশ রাত করে শুয়েছিলাম। ৩০শে মে ১৯৮০। সকাল আনুমানিক ৬টা হবে। টেলিফোনে অত্যন্ত সংক্ষেপে ডিএমও ব্রিগেডিয়ার ওয়াহেদ আমাকে সেনাসদরে সত্বর আসতে বললেন। এতগুলো বছরের অভিজ্ঞতায় আমার বুঝতে বাকি রইল না এমন কোন কিছু ঘটেছে যে আমাকে কোন প্রকারে ইউনিফর্ম চাপিয়েই রওয়ানা হতে হবে এবং করলামও তাই। সেনাসদরে যাওয়ার পথে রাস্তায় তেমন কোন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। চিন্তা করছিলাম হয়ত আবার কোথাও কোন বিপ্লবের প্রস্তুতি হতে পারে কিন্তু এসব বিপ্লব সকালে কখনও হয়নি, সবইত মধ্যরাতের থেকে ভোরের মধ্যেই ঘটেছিল। সেনাসদরে পৌঁছে দেখলাম জনমানব শূন্য, কেবলমাত্র ঝাড় দেয়া হচ্ছে। তিন তলায় আমার অফিসে উঠার মুখেই ডিএমও এর সাথে দেখা। তিনি খুব দ্রুত সিজিএস মেজর জেনারেল নুরুদ্দীন খানের অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'চট্টগ্রামে গন্ডোগোল হয়েছে। প্রেসিডেন্টের উপর হামলা হয়েছে। ঠিক কি ঘটেছে এখনও পরিষ্কার নয়। তুমি যতদূর সম্ভব চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা কর। আর যতটুকুই জানতে পার আমাকে সিজিএস এর অফিসে জানাবে।' হাঁটতে হাঁটতেই তিনি চলে গেলেন। আমি দ্রুত আমার অফিসের দিকে উঠে আসলাম। রাষ্ট্রপতির প্রোগ্রামের দিকে তাকাতেই মনে পড়ল গতরাতে রাষ্ট্রপতির তো চট্টগ্রামে থাকার কথা। সেখানেই নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। কিন্তু তাঁর তো সার্কিট হাউসে থাকার কথা আর সেটাতো সেনানিবাস থেকে বেশ দূরে শহরের কেন্দ্রস্থলে। সেখানে কি ঘটতে পারে। ভাবলাম হয়ত বা সর্বহারাদের কোন তৎপরতা হলেও হয়ে থাকতে পারে। তবে জিয়াউর রহমানের সাথে সর্বহারাদের নেতা জিয়াউদ্দিনের যোগাযোগ সব সময়ই ছিল এবং তাদের সম্পর্কও আমার জানামতে ভালই যাচ্ছিল। কাজেই সর্বহারা কি জিয়ার বিরুদ্ধে এমন কিছু করবে?

টেলিফোনে চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিএসও-১ লেঃ কর্নেল সাফাত আহমেদ এর (পরে ব্রিগেডিয়ার, অবসর প্রাপ্ত) সাথে কথা বলার জন্য কল বুক করতে গেলে সামরিক এক্সচেঞ্জ আমাকে জানালো সকাল থেকেই চট্টগ্রাম সামরিক এবং বেসামরিক এক্সচেঞ্জ দুটোই বন্ধ । তারা কোন সাড়াই দিচ্ছেনা। এ খবরের সাথে সাথেই আমি বুঝতে পারলাম অত্যন্ত গুরুতর কিছু ঘটেছে যা অভ্যুত্থানের পর্যায়ে পড়ে তবে কত বড় আকারের সেটা তখনও বুঝতে পারছিলাম না। এর মধ্যেই ডাইরেক্টর সিগনালস কর্নেল এন এ চিশতি (পরে

মেজর জেনারেল, অবসর প্রাপ্ত) ডিএমওর খোঁজ করতে এলে আমাকে মৃদু স্বরে জানালেন যে, চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে আরও কয়েকজন নিহত হন চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এটা কেমন করে সম্ভব, তাও চট্টগ্রামে? এ অভ্যুত্থানও কি সিপাহী বিপ্লব? আর এত বড় সিপাহী বিপ্লব হলে তার কিছু লক্ষণ ঢাকাতেও দেখা যাওয়ার কথা। কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে সিপাহী বিপ্লব ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুর, বীর উত্তম একজন স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা। কয়েকদিন পূর্বেই, প্রায় ৩ বছর পর ঢাকায় মিরপুর স্টাফ কলেজের কমান্ডান্ট পদে বদলি হয়েছিল যদিও তিনি এবার ঢাকায় এ পোস্টিংকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি যেমনটা গ্রহণ করেছিলেন ১৯৭৫ সনে সি এম জি এস নিযুক্ত হওয়ায়।

অগত্যা আর্মি ওয়ারলেস রুমে গেলাম। সেখানে গিয়ে আর্মি কমান্ড ভয়েসে প্রথমে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে অপারেটর জানালো ডিভিশনের সেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সকাল থেকেই ঐ সেটের সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি। অপারেটর আরও বলল যে, রাষ্ট্রপতির সাথে রোভার সেটে (গাড়ীর উপরে রাখা) চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারে। প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা সরকার প্রধান যেখানে যেতেন সেখানে সামরিক অঞ্চল থেকে সার্বক্ষণিকের জন্য একটি সেট থাকত সেনাসদরের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য যা "রাষ্ট্রপতির রোভার" নামে পরিচিত ছিল। অপারেটর রোভারের সাথে যোগাযোগ করলে আমি চট্টগ্রামের অপারেটরের নিকট জানতে চাইলাম ওখানে কোন অফিসার আছে কিনা। উত্তরে আমাকে জানালো একটু দূরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পিএস (পারসোনাল সেক্রেটারি) কর্নেল মাহফুজ ছাড়া আর কেউ নেই। আমি কর্নেল মাহফুজকেই সেটে ডাকতে বললাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কর্নেল মাহফুজের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাইলে সে আমার কথার জবাব না দিয়ে আমাকে জানালো যে সেখানে সবই নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনসাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবকে হেলিকপ্টারে চট্টগ্রাম পৌঁছতে নির্দেশ দেয়া হোক। হেলিকপ্টার যেন চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে অবতরণ করে। এ কথা কয়টি বলে মাহফুজ সেট ছেড়ে চলে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর পাওয়া গেলনা। পরে চট্টগ্রামের অপারেটর জানালো মাহফুজ বেসামরিক পোশাকে একটি বেসামরিক জীপে চড়ে

সার্কিট হাউস ত্যাগ করেছে। আপাতত সেখানে আর কেউ নেই। আমি আরও কিছু জানার উদ্যোগ নিলে হয় চট্টগ্রামের অপারেটর সেট বন্ধ করে দিল অথবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমার আর মাহফুজের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন ডিএমও কে জানালে তিনি কোন মন্তব্য না করে সিজিএসকে জানালেন। তখন থেকে প্রায় একদিন চট্টগ্রামের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রইল। আর কোন যোগযোগ করাই সম্ভব হচ্ছিল না।

এবার আমার কোন সন্দেহই বাকি থাকল না যে, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে যা খবর শুনেছি তা সত্য আর তাই যদি হয় তবে মাহফুজের কথাবার্তা এত অসংলগ্ন হবে কেন? মনটা এতই খারাপ হয়ে উঠল যে, অনেকক্ষণ একা চুপচাপ বসে থেকে আরও কিছু বিস্তারিত খবরের জন্য বিভিন্ন হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। নেভাল হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করলে জানা গেল যে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনীর হাতে সার্কিট হাউসে নিহত হয়েছেন। আর প্রথম খবরই চট্টগ্রাম থেকে নেভাল হেডকোয়ার্টারের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সিএনএস রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান (প্রায়ত) আগের দিন রাষ্ট্রপতির সাথেই চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন এবং তিনি রাতে চট্টগ্রামের নেভাল হাউসেই ছিলেন। নেভাল হাউস সার্কিট হাউসের অতি সন্নিকটে বিধায় রাতে অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর যে গোলাগুলী চলে তার আওয়াজ শুনতে পান এবং সকাল প্রায় ৫টা ৩০ মিনিটের দিকে সার্কিট হাউসে গিয়ে জিয়াউর রহমানের মৃতদেহ দেখার পরপরই তিনি পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেই চট্টগ্রাম নেভাল বেস থেকে একটি ছোট যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে নারায়নগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। তার না ফেরা পর্যন্ত নেভাল হেডকোয়ার্টার এর বেশী কিছু জানাতে পারছেনা।

আমি এবার এয়ার হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে লেগে যাই। সেখান থেকে বিস্তারিত কিছুই জানতে পারলাম না শুধু আগে যা জানতে পেরেছি তারই পুনরাবৃত্তি করল। তবে জানলাম যে তাদের চট্টগ্রামের সাথে তেমন যোগাযোগ নেই আর যেহেতু সার্কিট হাউস ও সেনানিবাস থেকে তারা অনেক দূরে তাই বিস্তারিত সংবাদ তখনও সংগ্রহ করতে পারেনি ।

সবশেষে আমি বিডিআর হেডকোয়ার্টারে পরিচালক বিডিআর অপারেশনের কর্নেল ওয়াজী আহমেদ চৌধুরীর (অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার) সাথে আরও তথ্য জানার উদ্দেশ্যে কথা বললাম। বিডিআর এর নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের

সকল সংস্থার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। তিনি জানালেন সকাল থেকেই তিনি চট্টগ্রাম সেক্টর কমান্ডারকে খুঁজে পাচ্ছেন না। শুধু জানালেন সকালেই সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল আজাদ, ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হওয়ার পর থেকে তার সাথে আর কোন যোগাযোগই নেই। কাজেই তারাও সঠিকভাবে বিস্তারিত কিছুই জানাতে পারছেনা।

বিভিন্ন সূত্র থেকে যা সংগ্রহ করলাম তাতে প্রাথমিকভাবে জানলাম চট্টগ্রামে গতরাতে (৩০ মে) এক সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং এর সূত্রপাত চট্টগ্রামস্থ অফিসারগণ করে। একদল সশস্ত্র সেনাসদস্য সার্কিট হাউস রেইড করে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করে। তবে কারা এর সাথে জড়িত তা তখনও পরিষ্কার হয়নি। কারা এ অভ্যুত্থানে জড়িত এবং ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের কতখানি ভূমিকা বা ডিভিশন হেডকোয়ার্টার পাল্টা কোন কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা তখনও কিছুই স্পষ্ট হয় নি। যা তথ্য ঐ পর্যন্ত আমি জানতে পারলাম ততটুকুই ডিএমওকে জানালাম। অপর দিক থেকে এমআই এর (মিলিটারি ইনটেলিজেন্স) তরফ থেকেও পাওয়া তথ্যগুলো সিজিএসকে দেয়া হচ্ছিল। অপারেশন ডাইরেক্টরেট থেকে আমি আমার তথ্যাদি সিজিএস এর অফিসে নিয়ে গেলে সেখানে ডিএমও এবং ডিএমআই ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরীকে সিজিএস এর সাথে দেখলাম। সকাল থেকেই সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার অফিসে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি সিজিএস সেনাপ্রধানকে অবহিত করতে থাকলেন। অফিসের সময় হওয়াতে আস্তে আস্তে সেনাসদরে কর্মরত অফিসারগণ যার যার অফিসে এসে পৌছতে লাগল। সেনাসদরে এসেই তারা এ ঘটনা সম্বন্ধে জানতে শুরু করলেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত অবস্থায় শেষ খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেন।

সিজিএস এর অফিসে গিয়ে কিছুটা প্রাথমিক তথ্য পেলাম। রাষ্ট্রপতির হত্যার খবর সামরিক সচিবের মাধ্যমে সিজিএস জানতে পারেন এবং সাথে সাথে সেনাপ্রধানকে জানান। সেনাপ্রধান পিএসওদের ডেকে সেনাসদরে প্রথমে খবরটা সকলকেই জানান। উল্লেখ্য যে, উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তখন সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেনাপ্রধান এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তাঁকে হাসপাতালে গিয়ে খবরটি জানান এবং তাঁকে অনুরোধ জানানো হয় তিনি যেন উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ সংকটময় মুহূর্তে সরকার প্রধানের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে সেনাবাহিনীকে পরবর্তী

পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। প্রথমে তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ হলেও পরে তিনি হাসপাতাল থেকে বঙ্গভবনে যাওয়া সাব্যস্ত করেন।

ইতিমধ্যে ফরমেশন কমান্ডারগণকে প্রাপ্ত অথ্যাদির ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিয়ে সেনাসদরের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে বলা হয়। বিস্তারিত তথ্যাদি এবং ঢাকার বাইরের ফরমেশনগুলোর জন্য সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে জরুরী ভিত্তিতে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত টেলিফোন লাগানো হয়। সিজিএস এর নির্দেশে তার সন্নিকটে এমআই এর অপারেশন রুমে এমও ও এমআই এর 'জয়েন্ট অপারেশন রুম' স্থাপন করা হয়। সেনাসদরের সিগন্যাল সেন্টারকে নিয়ন্ত্রণে এনে ঢাকার বাইরের যে কোন কল পূর্ব অনুমতি ছাড়া গ্রহণ বা প্রেরণ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ঢাকার সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সতর্ক করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সেনাসদরের ডাইরেক্টরেট পর্যায়ের অফিসারদের জয়েন্ট অপারেশন রুম থেকে ব্রিফিং দেয়া হবে যাতে সেনাসদরের অফিসার ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকরা Information gap এ না ভোগেন।

এ সব ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে করার ফলে কোন গুজব বা অতিরঞ্জিত তথ্যের জন্ম দেয়নি। সময় ক্ষেপণ না করেই সিজিএস এর তত্ত্বাবধানে সংকটকালীন ব্যবস্থাপনা অতীতের যে কোন সংকট মোকাবেলার তুলনায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ বিবেচিত হয়। রেডিওতে যথারীতি রুটিন প্রচার চলতে থাকে। সকাল প্রায় ৮টা কি ৯টার দিকে ডিএমআই চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশনে থেকে তথাকথিত বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল গঠন ও তাদের অন্যান্য ঘোষণা শুনতে পেরে সিজিএসকে চট্টগ্রাম রেডিও ঘোষণার বিষদ বিবরণ দেন। অপারেশন রুমে রক্ষিত রেডিও থেকে অত্যন্ত দুর্বল রিসিপশন হলেও এ প্রচার আমরা শুনছিলাম।

চট্টগ্রাম রেডিওর ঘোষণার প্রথমদিকে দেশের অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য জিয়াউর রহমানের সরকারকে দায়ী করে এ সব রোধ কল্পে সমগ্র সেনাবাহিনীতে রেভ্যুলিউশনারী কাউন্সিল গঠন করা এবং রেভ্যুলিউশনারী কাউন্সিল কর্তৃক দেশ পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এই কাউন্সিল কর্তৃক দেশের পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়। শাসনতন্ত্র স্থগিত রেখে মার্শাল 'ল' প্রবর্তনের কথাও বলা হয়। আরও ঘোষণা দেয়া হয় যে, এখন থেকে দেশে মদ, জুয়া ইত্যাদি বন্ধ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর বেতন ভাতা ইত্যাদি না বাড়িয়ে সরকার যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া

হবে বলে ও ঘোষণা দেয়া হয়। সেই সাথে সমস্ত সেনানিবাসে রেভ্যুলিউশনারী কমান্ড কাউন্সিল কাজ শুরু করবে বলে জানানো হয়। সেনাবাহিনীর উচ্চপদে রদবদল, কিছু সিনিয়র অফিসারদের বরখাস্ত এবং অবসর দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয় কিছু অফিসাদের নাম উচ্চারণও করা হয় যেমন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে লেঃ জেনারেল পদ থেকে মেজর জেনারেল পদে অবনতি করে বরখাস্ত করে তার স্থলে মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান পদে নিযুক্তির ঘোষণাও দেয়া হয়েছিল। সেদিন এ ব্রডকাস্ট যারা শুনেছেন তাদের মনে এ অভ্যুত্থানের হোতাদের চিহ্নিত করতে বেগ পেতে হয়নি। এদিকে সেনাসদরে এ ব্রডকাস্টকে তেমন বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়নি তবে এর মাধ্যমে যে কাজটি হয়েছিল তা হল এ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সে সময় যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেনাসদরও তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করে নিল।

কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ উপরাষ্ট্রপতি সেনাপ্রধানের আশ্বাসের পর এ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া শুরু করলেন। চট্টগ্রামের রেডিও ব্রডকাস্ট দেশে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে এ পর্যায়ে যদি এর বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়া হয়। এসব কথা বিবেচনা করে প্রায় ৯টার দিকে উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে জাতির উদ্দেশে রেডিও টিভিতে সংক্ষিপ্ত এবং দৃঢ় ভাষায় রাষ্ট্রপতির হত্যা, সামরিক অভ্যুথান এবং এর বিরুদ্ধে সরকারী পদক্ষেপের কথা দেশবাসীকে জানালেন। তার ভাষণ এবং ঘোষণার মাধ্যমেই দেশবাসী এ নির্মম হত্যাকান্ডের কথা জানতে পারল। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে দেশের জনগণকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সংকটের মোকাবেলা করতে আহ্ববান জানান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন তা হল সামরিক বাহিনীকে এ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া। যে ভুল ১৯৭৫ সনে সে সময়কার সরকার করেছিল, ১৯৮১ তে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি যার ফলে সেনাপ্রধান ও সেনাসদরের তরফ থেকে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে কোনরূপ দ্বিধা বা ভুল হয়নি। যা হয়েছিল ১৯৭৫ সনে এবং এর জন্য এখনও শুধুমাত্র তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল (অবঃ) সফিউল্লাহকে দোষারোপ করা হয়।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর সেনাপ্রধান ঢাকার সকল কমান্ডার এবং সেনাসদরে কর্তব্যরত অফিসারদের সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ বিস্তারিতভাবে অবগত করান এবং

এ অভ্যুত্থানে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুরের জড়িত থাকার কথা জানান। এ অভ্যুত্থানের সাথে একই ডিভিশনের অন্যান্য অফিসারদেরও জড়িত থাকার কথা বলেন। এদিকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সময় নষ্ট না করে সেনাপ্রধান চট্টগ্রামে অবস্থানরত সকল অফিসার ও সৈনিকদের সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে এবং অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত সমস্ত সদস্যগণ পরের দিন অর্থাৎ ৩১শে মে বিকেল ৪.৩০ মিনিটের মধ্যে আত্মসমপর্ণ করার জন্য রেডিও টিভিতে ঘোষণা দেবেন এবং যা কয়েকবার প্রচার করা হবে। রেডিও টিভি ততক্ষণে রুটিন প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে পবিত্র কোরআন তেলায়াত প্রচার করছিল। দুপুরের দিকে সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেনাপ্রধান রেডিও এবং টিভিতে ঘোষণা দিলেন। সেনাপ্রধানের এ পদক্ষেপ শুধু দেশবাসীই নয় সমগ্র সেনাবাহিনীতে সকল প্রকার গুজব এবং সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে কার্যকরি দিক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রামে অন্যান্য অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে সকাল থেকে যে উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা ছিল তাও এ ঘোষণায় দূর হল।এ ঘোষণায় এবং চট্টগ্রামের সাধারণ সৈনিকদের অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দেয় যা পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্রোহ দমনের অনুকূলে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়।

যখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং সেনাপ্রধান রেডিও, টিভিতে ভাষণ আর ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার পটভূমি আর অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মঞ্জুর বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকদেরকে সমাবেশের মাধ্যমে বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ সৈনিকদের সাপোর্ট নেয়া কিন্তু তিনি কোথাও তেমন কোন উৎসাহ ব্যাঞ্জক সাড়া পেলেন না। বিশেষ করে সেনাপ্রধানের ঘোষণার পর সৈনিকদের মধ্যে জিয়া হত্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। উল্লেখ্য যে, জিয়া সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। অন্যদিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আর সেনাপ্রধানের রেডিও, টিভিতে ঘোষণার পর অভ্যুত্থানে জড়িত অফিসারদের মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দিল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা সেনাসদরের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

অন্যদিকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সেনাপ্রধানের দেয়া আত্মসমর্পণের সময় পার হওয়ার পর বিমান বাহিনী ব্যবহার এবং কুমিল্লার ৩৩ ডিভিশনকে শুভাপুর ব্রীজ (যা কুমিল্লা আর চট্টগ্রামের মধ্যে সেনা ডিভিশনের সীমারেখা) পার হয়ে চট্টগ্রামে

প্রবেশ করবে। এ পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কুমিল্লা থেকে ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে (পরে মেজর জেনারেল, অবঃ রাষ্ট্রদূত) তার ব্রিগেডকে শুভাপুর ব্রিজের নিকট ফেনী নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। অন্য আর একটি ব্রিগেড এবং ডিভিশনের ইউনিটগুলোকে সর্তক অবস্থায় রাখা হয় যাতে প্রয়োজনবোধে চট্টগ্রামে অভিযান চালানোর শক্তি বাড়ানো যায়। এসব সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল ব্যবস্থা ত্বরিতগতিতে সম্পন্ন করা হয়। আত্মসমর্পণের সময় শেষ হওয়ার বহু আগেই কুমিল্লা থেকে ব্রিগেড শুভাপুর ব্রিজ পর্যন্ত পৌছে যায়।

চট্টগ্রামে যে সব ইউনিট অভ্যুত্থানের প্রথম এবং পরবর্তী পর্যায়ে সমুদ্র ও বিমান বন্দরে নিয়োগ করা হয়েছিল মঞ্জুরের নির্দেশে, সে সমস্ত ইউনিট থেকে বহু সৈনিক ও অফিসার আত্মসর্ম্পণের জন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাস ত্যাগ করা শুরু করে। এ সব কারণেই আস্তে আস্তে বিদ্রোহী অফিসারদের মনোবল ভাঙ্গতে শুরু করে।

প্রায় দুপুরের দিকে চট্টগ্রাম থেকে প্রথম সেনাসদরের সাথে লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান যোগাযোগ করে। আমি তখন সিজিএস এর রুমে দুটি টেলিফোন মনিটর করছিলাম। এর কিছুক্ষণ আগে মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর নাম ঘোষণা করায় তিনি বিব্রতকর অবস্থায় ঢাকার সরকারের প্রতি আনুগত্য থাকার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে এবং সেনাপ্রধানের সাথে দেখা করলেন। তিনি দুঃখ করে বলেন মঞ্জুরের ঘোষণা তার সম্বন্ধে সমগ্র সেনাবাহিনীতে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেবে। সত্যই তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সুপ্রীম কমান্ডারের পিএসও ছিলেন। মীর শওকত আলী অত্যন্ত বন্ধুসুলভ আর সহজ ব্যবহারের জন্য জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তার ভেতরে কোন অহমিকা দেখা যায় নি যা ছিল মঞ্জুরের স্বভাবে। মঞ্জুর কিছুটা উদ্ধত আর বেশ উচ্চাভিলাষী ছিলেন।

মতিউর রহমানের টেলিফোনে কথোপকথনে কিছুটা রুক্ষতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। সে আমার সাথে কোন কথা বলতে চাইল না। বারংবার সিজিএস কে চাইতে থাকলে আমি রিসিভার মেজর জেনারেল নুরুদ্দীন খানের দিকে এগিয়ে দিলাম। মতিউর রহমান কয়েক মিনিটের বাক্যালাপে তার জিওসির পক্ষ থেকে সেনাসদরকে এক রকম ধমকের সুরে জানালো যে, চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলে তার দায়-দায়িত্ব সেনাসদরই বহন করবে। সিজিএস অত্যন্ত ঠান্ডা

মেজাজে তার কথা শুনে তাদেরকে আত্মসমর্পণের কথা মনে করিয়ে দিলেন। ঐ দিনই আরও পরে মতিউর রহমান বেশ কয়েকবার নানা ধরনের উস্কানিমূলক কথাবর্তা বলতে থাকে বিশেষ করে সিজিএস এবং ডিএম আই, ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরীর সাথে। কিন্তু সিজিএস আত্মসমর্পণের কথা বারংবার বলে যাচ্ছিলেন। মতিউর রহমানের ঘন ঘন ফোন থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছিল যে, একটা মানসিক যুদ্ধ চালাবার প্রচেষ্টায় হয়ত কিছুটা সময় ক্ষেপণের চেষ্টা করছে যাতে যতটা সময় তারা (চট্টগ্রামে অভ্যুত্থানে জড়িত) পাবে ততখানি হয়ত সংঘঠিত হতে পারবে। যতই বেলা গড়াতে লাগল ততই চট্টগ্রামে অবস্থিত সৈনিকদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তুতি বাড়তে লাগল। কুমিল্লা থেকে যে কোন অভিযান ঠেকানোর জন্য একটি ইউনিটকে শুভাপুর ব্রিজের নিকট ফেনী নদীর তীরে চট্টগ্রামের তরফ থেকে মোতায়েন করা হয়। ইউনিটগুলোকে আত্মসর্ম্পণ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রায় সারাদিন অভ্যুত্থানে জড়িত কোন না কোন অফিসার বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করতে এবং সৈনিকদের আত্মসম্পর্ণ থেকে নিবৃত থাকার অনুনয় ও ধমক দেয়া অব্যাহত রাখল। সন্ধ্যা থেকে, তখনও আত্মসমর্পণের সময়ের ২৪ ঘন্টারও কম সময় বাকি, কিছু কিছু সঠিক তথ্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে পৌছান অব্যাহত রইল। আমরা কয়েকজন অনবরত অপারেশন, তথ্য রুম আর সিজিএস এর সাথে যোগাযোগ রেখেই চলেছি আর প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণসহ সিজিএসকে জানাচ্ছিলাম। এতক্ষণে গোয়েন্দা পরিদপ্তরে প্রায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের কারণে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এবং অভ্যুত্থানকারি অফিসারদের গতিবিধিরও খবরা খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এর মধ্যেই মঞ্জুর বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিভিশন কমান্ডারদের সাথে তার অনুকূলে সাপোর্টের জন্য যোগাযোগ করে কিন্তু কারও কাছ থেকেই তিনি তেমন কোন সাড়া পান নি। কুমিল্লার জিওসি মেজর জেনারেল আব্দুস সামাদকে তিনি চিঠিতে লেখেন তাকে সাপোর্ট করার জন্য কিন্তু সামাদ তাতে কর্ণপাত না করে সেনাসদরে সে চিঠি পাঠানোর কথাও জানিয়ে দেন। বেশ কয়েকদিন পরে সামাদ সেনাসদরে এলে চিঠিখানা আমাদেরকেও দেখান। যেমনটা বলেছিলাম ৩০ তারিখ প্রায় দুপুরের দিকে মঞ্জুর চট্টগ্রামের হালিশহরে তার অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে সৈনিকদের বুঝাবার চেষ্টা করে এবং সৈনিকদের তার পক্ষে হাত তুলে সমর্থন জানাতে বললে তাদের তরফ থেকে তেমন কোন স্বতস্ফূর্ত সাড়া না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। উল্লেখ্য এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িতরা বেশীর ভাগই বিভিন্ন স্তরের অফিসার, এখানে সাধারণ সৈনিকদের ভূমিকা ছিলনা বললেই চলে।

এর আগে সকালে মঞ্জুর সমস্ত কমান্ডারদের এবং অন্যান্য অফিসার যারা এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত নয় এবং ডিভিশনের বাইরের সিনিয়র অফিসারদের ডেকে তার টেবিলের উপর রাখা পবিত্র কোরআন শরিফ ছুঁয়ে তার (মঞ্জুরের) স্বপক্ষে থাকার শপথ করতে বললে সকলেই বিনা আপত্তিতে শপথ করেন। মঞ্জুর সকাল থেকে বিএমএ কমান্ডান্ট ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহকে (পরে অবঃ ও বিএনপি'র দল থেকে মন্ত্রী) সব সময় নিজের সাথেই রেখেছেন। এ দিনই দুপুরের দিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বেসামরিক কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে কমিশনার, ডিআইজিকেও অনুরূপভাবে শপথ বাক্য পাঠ করান। এ ধরনের শপথ করিয়ে তিনি কতখানি আশ্বস্ত হলেন তা জানা যায় নি তবে এসব করে তিনি তার দুর্বলতাই প্রকাশ করেছেন বেশি। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, তিনি যদি সফল একটি অভ্যুত্থানের নেতা হতেন তবে তাকে এ ধরনের শপথ বাক্য পাঠ করাতে হত না। তবে তিনি হয়ত তখন বুঝতে পারেননি যে In case of his failure, these all oath of aligience(!) will have no meaning to any one who took them. এবং হয়েছেও তাই।

বিকেলের দিকে মঞ্জুর চট্টগ্রাম বেসামরিক বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে অভ্যুত্থান এবং তার ধ্যান ধারণা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং ঘোষণা করেন যে চট্টগ্রামকে ঢাকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হবে যতদিন পর্যন্ত ঢাকা চট্টগ্রামের নিকট আত্মসমর্পণ না করে । বস্তুত এর মাধ্যমে তিনি চট্টগ্রামে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের চিন্তাই করছিলেন। তিনি মার্শাল 'ল' রেগুলেশান ইত্যাদির কথাও বলতে থাকেন। মঞ্জুর সে সময়ে সামরিক পোশাকের বদলে বেসামরিক পোশাকে ছিলেন এবং তারপর থেকে তিনি আর সামরিক ইউনিফর্ম পরেন নি। আরও খবর পাওয়া গেল যে, নিহত রাষ্ট্রপতির এবং তার সাথে নিহত তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রধান লেঃ কর্নেল আহসান, ক্যাপটেন হাফিজ এবং অন্য আর এক জুনিয়র অফিসারের মৃতদেহ সার্কিট হাউস থেকে সরিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সাথে যে কয়জন নিরপত্তা প্রহরিও নিহত হয় তাদের মৃতদেহ সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেনাসদর থেকে অনেক যোগযোগ এবং অনুরোধ করা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম থেকে রাষ্ট্রপতি মৃতদেহের হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। এমন কি রেডক্রসের মধ্যস্থতায় মৃতদেহ খুঁজে বের করার প্রস্তাবও মঞ্জুর প্রত্যাখ্যান করেন। রাতের দিকে আরও টুকরো খবরে আসতে লাগল। চট্টগ্রাম ডিভিশনের প্রায় সব ব্রিগেড কমান্ডারই এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত হয়েছিলেন বা কোন পর্যায়ে জড়িত হয়ে পড়েন। ৩০শে মে সকালের দিকে যখন

অভ্যুত্থানকারীরা সার্কিট হাউসে হামলা করে তখন প্রচন্ড বজ্রপাত এবং মূষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। আর সেদিন সকালেই জিয়াউর রহমানের চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফেরার কথা ছিল।

রাতে সেনাসদরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ঢাকায় অবস্থিত ইউনিটগুলোর উপরে কড়া নজর রাখার জন্য নিয়োজিত করে ডিএমআই সর্বত্র খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। ৩১শে মে সকালের মধ্যেই কুমিল্লা থেকে মাহমুদুল হাসানের ব্রিগেড এসে ফেনী নদীর পাড়ে পৌছে। ব্রিগেড পৌছার পরপরই চট্টগ্রাম থেকে কিছু কিছু সৈনিক আত্মসমর্পণের জন্য ইউনিট ত্যাগ করা শুরু করে। সকাল থেকেই চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে যতই সৈনিক এবং ইউনিট সমূহ আত্মসমর্পণ করার জন্য অগ্রসর হতে লাগল তত ঘনঘন চট্টগ্রাম হতে বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকার সাথে যোগাযোগ বাড়তে লাগল। ডিএমআই, সিজিএস এর রুমে টেলিফোনের সাথে স্পীকার লাগিয়ে দিলেন যাতে সেখানে উপস্থিত সবাই চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার কথোপকথন শুনতে পারেন। যদিও চট্টগ্রাম থেকে একই সুরে উস্কানিমূলক কথা বলতে থাকলেও বোঝা গেল সেখানকার পরিস্থিতি যে তাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সেটা তারাও টের পেতে শুরু করেছে। সেনাসদরের দেয়া আত্মসমর্পণের শেষ সময় যতই সন্নিকটে আসতে থাকে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ততই বিদ্রোহী অফিসারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। বেশ কিছু ইউনিট আত্মসমর্পণ শুরু করলে চট্টগ্রাম থেকে যোগাযোগের মাত্রাও বাড়তে শুরু করল। ৩১ তারিখ বোধকরি দুপুরের দিকে চট্টগ্রাম থেকে হান্নান শাহ, মঞ্জুরের হয়ে ফোনে প্রথমে সেনাপ্রধানের সাথে কথা বলতে চাইলেও পরে সিজিএস এর সাথে কথা বলে মঞ্জুরের কিছু সর্তের কথা জানালেন। তার টেলিফোনের কথায় মনে হল তিনি মঞ্জুরকে সামনে রেখেই কথা বলছেন। সে সর্তগুলো দিয়েছিল তা বোধহয় পূর্বে মতিউর রহমানের মাধ্যমে একবার সিজিএসকে জানানো হয়েছিল বলে সিজিএস চুপচাপ শুনে কোন মন্তব্য না করে আত্মসমর্পণের সময়সীমার কথা পুনরাবৃত্তি করলেন মাত্র। সর্তগুলো ছিল, (ক) সমগ্র দেশে সামরিক শাসন জারি করণ, (খ) রেভ্যুলউশনারী কাউন্সিল গঠন করা ও তার স্বীকৃতি, (গ) জাতীয় পরিষদ বাতিল, (ঘ) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ। কিন্তু মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুরের নিয়োগ কি হবে সে সম্বন্ধে কখনই কিছু বলা হয় নি। সিজিএস সর্তগুলো কাগজে টুকে রাখলেন মাত্র। সিজিএস এবার জানালেন যে, আত্মসমর্পণের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর এয়ারস্ট্রাইক করা হবে।

৩১ শে মে ৪টায় আত্মসমর্পণের শেষ সীমা। সকাল থেকে অনেক ইউনিট আত্মসমর্পণ করার জন্য কুমিল্লা চট্টগ্রাম সীমারেখা পার করে মাহমুদুল হাসানের ব্রিগেডে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। আরও ইউনিট আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার সংবাদ আসতে থাকে। সকাল থেকেই চট্টগ্রামের আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল বিধায় এয়ার স্ট্রাইকে অসুবিধে হবে বলে সবাই মতামত পোষণ করলেন। আর তা ছাড়া এয়ার স্ট্রাইকের অদৌ তেমন কোন প্ল্যান ছিল না। কেবলমাত্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করার জন্যই Air threat এর কথা বলা হয়। আবহাওয়ার কথা চিন্তা করেই আত্মসমর্পণের সময়সীমা ১লা জুন সকাল ১০টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

৩১ তারিখ রাতে আবার শুরু হল চট্টগ্রামের সাথে টেলিফোনে বাকযুদ্ধ। সমস্ত সময়েই কথা বলার উদ্যোগ নেয়া হয় চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে। অবশেষে গভীর রাতে প্রথম এবং শেষ বারের মত মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুর সিজিএস মেজর জেনারেল নুরুদ্দীন খানের সাথে ফোনে একান্তে কথা বলেন। এ দু জনার কথার সময় আমরা রুম ছেড়ে চলে আসি। কিন্তু কি বিষয়ের উপর এ কথা হয় তা জানতে পারা যায়নি।[১]

ভোর হওয়ার পূর্বেই ব্রিগেডিয়ার আজিজুল ইসলাম (মরহুম) ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমানডান্ট, টেলিফোনে সিজিএসকে জানালেন মঞ্জুর এবং অভ্যুত্থানে জড়িত অন্যান্য অফিসারগণ তাদের পরিবারসহ সেনানিবাস ত্যাগ করেছেন। তাদের সেনানিবাস ত্যাগের সাথে সাথেই এ ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সমাপ্তি ঘটে। সরকার ও সেনাসদরের তরফ থেকে ব্রিগেডিয়ার আজিজুল হককে সমস্ত বিদ্রোহী অফিসারদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হল আর নিহত রাষ্ট্রপতির মৃতদেহ খুঁজে বের করে ঢাকায় পাঠাবার বন্দবস্ত করতে বলা হল। বিদ্রোহ শেষ হলেও তখনও বিদ্রোহী অফিসার, মাত্র কয়েকজন ছাড়া যাদের মধ্যে একজন বাদে, সব ব্রিগেড কমান্ডারদের গ্রেফতার করা হয়। মঞ্জুর এবং তার সাথের অফিসার যারা সেনা নিবাস ছেড়ে পালিয়ে যায়, তাদেরকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি বলে পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থাকে জরুরী নির্দেশ দেয়া হল। ১লা জুন প্রায় সমস্ত দিনই কোন না কোন অফিসারের গ্রেফতারের খবর আসতে থাকল। মঞ্জুর সম্বন্ধে সকালে যা জানা গেল তাতে শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত

১। *Bangladesh A Legacy of Blood* বইটিতে ও এর উল্লেখ রয়েছে।

তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যদের গুই মারার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন বলে জানা যায় ।

ঐ দিনই বোধ হয় দুপুরের দিকে সংবাদ এলো লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান এবং লেঃ কর্নেল মাহবুব পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি ইনফেনট্রি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক এবং মঞ্জুরের আত্মীয়, দুজনেই ১২ ইঞ্জিনিয়র ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের সাথে গুলাগুলীতে ফটিক ছড়ির কাছাকাছি জায়গায় নিহত হয়। তাদের সাথের আর দুজন অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। এরা সবাই মঞ্জুরের গাড়ীর সারিতেই ছিল তবে কোন কারণে এ চারজনকে বহনকারি জীপটি পিছিয়ে পড়ায় এরা এসব সৈনিকদের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ওদিকে মঞ্জুরের দল এ গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পরিবারসহ আরও কিছুদূর গিয়ে গাড়ী ছেড়ে পায়ে হেঁটে একটি চায়ের বাগানে পৌছে এক কুলির বাড়ীতে আশ্রয় নেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের হাতে মঞ্জুর ধরা পড়েন। পুলিশের হাতে ধরা পরার পর হাজার হাজার মানুষের ভীড় জমতে থাকে। এসব মানুষের মধ্যে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকলে মঞ্জুরের উপরে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। পুলিশ অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করলেও অল্পসময়ের মধ্যে জনতার ভীড় বাড়তে থাকে। এ সময় মঞ্জুরকে খুঁজতে খুঁজতে সেনানিবাস থেকে একদল সৈন্য জনতার রোষ থেকে তাকে উদ্ধার করে সেনানিবাসে নিয়ে আসার পথে সেনানিবাসের ভেতরে সিএসডির কাছে উত্তেজিত সৈনিকদের হাতে নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। অবশ্য এ ঘটনা আমরা আরও পরে জানতে পারি।

অভ্যুত্থানে জড়িত অফিসারদের গ্রেফতার এবং মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুরের মৃত্যুর সাথে যবনিকা পড়ে আর একটি রক্তাক্ত ব্যর্থ অভ্যুত্থান।

এগারো

অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই জিয়ার মৃতদেহ খুজেঁ বের করার জন্য তল্লাশি চলতে থাকে। অবশেষে রাঙ্গুনিয়ার নিকট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সন্নিকটে একটি গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দেয়া অবস্থায় জিয়াসহ আরও দুজন অফিসারের লাশ পাওয়া যায়। দুদিন পার হয়ে যাওয়ায় লাশগুলো গলতে শুরু করেছিল। পরে চট্টগ্রাম থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় লাশ ঢাকায় বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার যোগে নিয়ে এসে ময়না তদন্ত করার পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় একদিন পুরানো সংসদ ভবনে রাখা হয়, পরে শেরে বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ সংলগ্ন ক্রিসেন্ট লেকের ধারে দাফন করা হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিলিটারি ফিউন্যারেলের পরিকল্পনা করা হলেও লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ের চাপে সমস্ত ব্যবস্থাই মুলতবি করে দিতে হয়। এর পূর্বেই হাজার হাজার লোক জিয়ার কফিনের পার্শ্বে অশ্রুসজল চোখে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

যে ধরনের দাফন স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাওনা ছিল তা তিনি পাননি কিন্তু জিয়া মরে গিয়েও সে সম্মান পেলেন। তার এক মাত্র কারণ সে সময়ে (১৯৮১) সেনাবাহিনীর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর শ্রদ্ধাশীল থাকায় এবং সেনাপ্রধানের ত্বরিত গতিতে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সেনাসদর এ সঙ্কটময় মুহূর্তে যে কর্মতৎপরতা দেখাতে পেরেছে যা ছিল অতীতের তুলনায় নিখুঁত। তার পেছনে ছিল কতগুলো বছরের অভিজ্ঞতা, ম্যাচুরিটি এবং সফল Crisis management.

রাজনৈতিকভাবে শাসনতন্ত্রের ধারা বজায় থাকাতে উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছিলেন এবং সকল রাজনৈতিক দল নিজেদের মতভেদ ভুলে গিয়ে সেনাবাহিনীর সকল তৎপরতাকে সমর্থন ঐ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে সমর্থন যোগান আর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেদিন জাতির

সংকটলগ্নে তারা যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

আস্তে আস্তে চট্টগ্রামে স্বাভাবিক জীবন শুরু হয়। অভ্যুত্থান তদন্তের জন্য মেজর জেনারেল মোজাম্মেল হক (পরে রাষ্ট্রদূত ও অবসর প্রাপ্ত)-এর তত্তাবধানে একটি সামরিক তদন্তের আদেশ দেয়া হয়। আর সরকারের তরফ থেকে একটি বেসামরিক জুডিসিয়ারী তদন্ত শুরু করা হয়।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নেতা মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুর একজন সুপরিচিত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, তেজস্বী এবং মেধাবী অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে সুপরিচিত ছিলেন তবে পরবর্তীতে তিনিও হয়ে উঠেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী । তার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান Career patern অনেক তরুণ এবং মধ্যে র‍্যাংকিং অফিসারকে তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে টানতে সক্ষম হয়। জিয়াউর রহমান যখন প্রধান সামরিক শাসক ছিলেন তখন তিনি (মঞ্জুর) দীর্ঘদিন সিজিএস থাকার সুবাদে সামরিক এবং বেসামরিক বিষয়ে নিজেকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রাখেন। আর এ সুবাদেই তিনি জাতীয় পর্যায়ে অনেক পলিসি মেকিং এর সাথে জড়িয়ে ছিলেন। ক্ষমতার অতি নিকটে থেকে তিনি আরও উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামে জিওসি থাকায় Counter Insurgency অপারেশনের প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হওয়ার সুবাদে এক বিরাট বাহিনীর কমান্ডে ছিলেন। পদাধিকার বলে তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক কার্যকলাপের মুখ্যসমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে হয়। তার প্রণোদিত পলিসিতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে, বিশেষ করে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের কিছু অংশে ব্যাপকভাবে বাঙালীদের পুনর্বাসন করা হয়। কোথাও কোথাও এ পুনর্বাসন রক্ষার্থে এ সব লোকজনকে অনেক হাতিয়ারও দেয়া হয়।

সামরিক দিক থেকে চট্টগ্রাম ডিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং Insurgency দমন করার জন্য চারটি ব্রিগেডে এবং বিরাট সংখ্যক আধাসামরিক বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। চারটি ব্রিগেডের তিনজন ব্রিগেড কমান্ডারই ছিলেন মঞ্জুরের সহমুক্তিযোদ্ধা অফিসার। শুধুমাত্র একজন কমান্ডারই ছিলেন প্রত্যাগত অফিসার। আশ্চার্যজনকভাবে অভ্যুত্থানের সময়ে তিনি সাময়িক ছুটিতে ঢাকায় ছিলেন। প্রায় সমস্ত ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার, প্রধান স্টাফ অফিসারগণ ছিলেন তাঁরই নির্বাচিত। এসব অফিসারের বেশীর ভাগই কোন না কোন সময়ে পূর্বে তার সাথে চাকুরি করেছিল। এমন কি কর্নেল মাহফুজ, জিয়াউর রহমানের

একান্ত সচিব নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে চট্টগ্রাম ডিভিশনে স্টাফ অফিসার ছিল। এও শোনা যায় যে, তারই (মঞ্জুরের) সুপারিশে মাহফুজ, জিয়াউর রহমানের একান্ত সচিব নিয়োজিত হয়। প্রায় সাড়ে তিন বছর এক নাগারে জিওসি থাকায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিবেশ যে সুযোগ তাকে এনে দিয়েছিল তার ব্যবহার তিনি করেন বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রভাব বলয় বিস্তার করার জন্য। তার এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং চাকুরি জীবনের সার্থকতা তার ভেতরে জন্ম দেয় এক ধরনের অহমিকা এবং এর কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে সবার অগোচরে ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাড়তে থাকে। তিনি প্রায়ই সেনাসদর ও সেনাপ্রধানকে এড়িয়ে সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এটাও তার এক ধরনের অহমিকার পরিচয় বহন করত। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় এ অভ্যুত্থানের পূর্বেও তিনি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন কিন্তু সময় এবং সুযোগের অভাবে তা কার্যকর হতে পারেনি। আর প্রত্যেকবারই মতিউর রহমান আর মাহবুবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যা এ দুজন অফিসার ২৯-৩০ শে মে তারিখের অভ্যুত্থানেও করেছিল।[১] চট্টগ্রামের এ ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়েছিল তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার (Hasty Decision) পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু মঞ্জুরকে স্টাফ কলেজে বদলি করা হয়। কাকতালীয় ভাবে জিয়াউর রহমানেরও জন্য প্রোগ্রাম তৈরী করা হয় এবং তিনি সেখানে রাত্রি যাপনেরও সিদ্ধান্ত নেন।

জিয়াউর রহমান সচরাচর দেশে ঢাকার বাইরে রাত্রি যাপন করতেন না। আর তা করলেও তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে সার্কিট হাউজেই থাকতে ভালবাসতেন। যা হোক পরে সরকারি শ্বেতপত্রে জানা যায় যে, কর্নেল মাহফুজ রাষ্ট্রপতির চট্টগ্রামের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত হওয়ার পর অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী লেঃ কর্নেল মতিউর রহমানও মাহবুবকে জানায় যে, যা কিছু করার এ সুযোগে না করতে পারলে ভবিষ্যতে আর এ সুযোগ নাও আসতে পারে। একথায় Now or Never.[2]

যে ব্যাপারটি আমার কাছে অভাবনীয় এবং আশ্চর্য মনে হয় তা হল মঞ্জুরের মত একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন সিনিয়র অফিসার এ অভ্যুত্থান চট্টগ্রামে ঘটাবার পরিকল্পনা কেন করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, চট্টগ্রামে থেকে ক্ষমতা

---

১. *Bangladesh : A Legacy of Blood, Ibid*
2. *Ibid*

দখল করতে পারবেন না যদি তার ডাকে অন্যান্য ফরমেশনে বিশেষ করে ঢাকাও চট্টগ্রামের মতই সাড়া না দেয়, যা বস্তুত হয়নি। তার হয়ত এটাও জানা থাকার কথা যে, সেনাসদর বা অন্য কোন ফরমেশন কমান্ডারদের তরফ থেকে এ ধরনের কোন সাড়া তিনি পাবেন না। তিনি তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর কোন বিশ্লেষণ হয়ত করেছিলেন বা করেন নি। যদি না করে থাকেন তবে তার বুদ্ধিমত্তার উপর সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তিনি হয়ত নিজেকে জিয়াউর রহমানের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করাবার আগে দেশবাসীর কাছে এবং সেনাবাহিনীতে জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তা সঠিকভাবে যাচাই করেন নি। আর তা যদি না করে থাকেন তবে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের মত ব্যক্তিত্ব, যার ব্যক্তি সততা ছিল বিতর্কের উর্ধ্বে, যার দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত এবং কাজ করার অফুরন্ত উদ্যম এ রকম একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় নেতা হিসেবে তৃতীয় বিশ্বে কম দেখা যায়। তবে এটাও সত্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে এবং রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে তিনি কিছু কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দুর্নীতি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতিকে হত্যার পর হত্যাকারি অফিসাররা জিয়ার রুমে একটি ডাইরি খোঁজ করেছিল। শোনা যায় যে, রাষ্ট্রপতির সে ডাইরীতে শাসকদলের দুর্নীতিপরায়ন রাজনীতিবিদদের নাম উল্লেখ করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তবে সব মিলিয়েই মেজর জেনারেল এমএ মঞ্জুর নিজেকে জিয়ার বিকল্প ব্যক্তিত্ব তৈরী করতে পারেননি। পারেননি সেনাবাহিনীতে তার ভাবমূর্তিকে জিয়ার ভাবমূর্তি থেকে ছাপিয়ে তুলতে।

এ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের জবাব হয়ত কোন দিন পাওয়া যাবে না। যেমন এতে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জড়িত ছিল কিনা তাও আজ পর্যন্ত জনসম্মুখে আসেনি।

আর একটি বিষয় আমি উল্লেখ না করে পারছিনা, তা হল ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ এর প্রায় সব কয়টি অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দানকারী অফিসারগণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন না কোন পর্যায়ে পাকিস্তান হতে পালিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন। এটা হয়ত নিছক অদ্ভুত যোগাযোগও হতে পারে।

আমি ১২ই জুন যুক্তরাষ্ট্রে স্টাফ কলেজ কোর্সের জন্য ঢাকা ত্যাগ করি। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে ২৪শে মার্চ ১৯৮২ সনের টেলিভিশন ক্যাবল নিউজে খবর পাই, সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে দেশে মার্শাল 'ল' জারি করেন।

াম এ মঞ্জুর, বীরউত্তম তৎকালীন জি ও সি ২৪ পাদাতিক ডিভিশন।

ল (পরবর্তীতে লেঃ জেনারেল সেনাপ্রধান) এম নুরুদ্দিন খান।
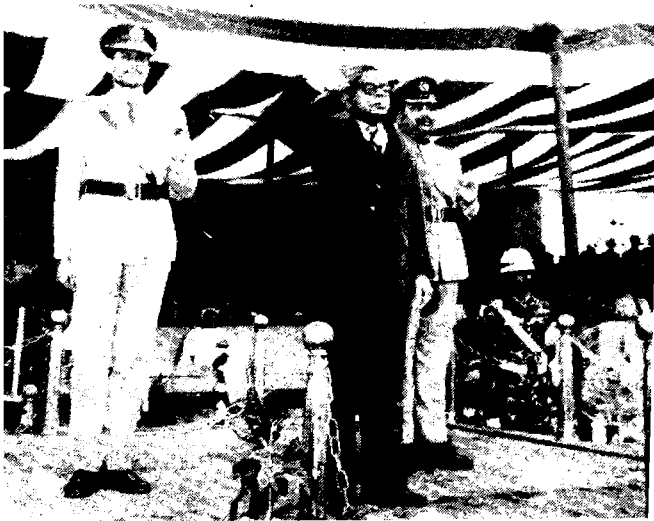
প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম (মাঝখানে), বামপাশে দাঁড়ানো তৎ
উপ-সেনাপ্রধান (পরে রাষ্ট্রপতি) মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।
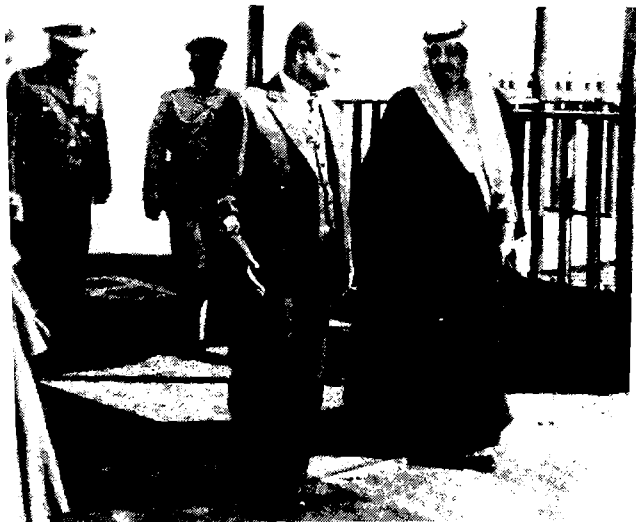
ডান দিক থেকে দ্বিতীয় জন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার

উপসংহার

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর ইতিহাস এ উপমহাদেশের অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনীর ইতিহাসের তুলনায় বেশ বৈচিত্র্যময়। পাকিস্তান বা ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর ই-তহাসে পাওয়া যায় সংঘবদ্ধ সশস্ত্রবাহিনীর জন্ম। যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষ শাসনের সূচনালগ্ন থেকে আর এ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীতে। এ ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্য আর সশস্ত্রবাহিনীর স্বকীয়তা বজায় রাখে উভয় দেশ এবং এদের কোড অব কনডাক্টও থাকে প্রায় অপরিবর্তীত। কিন্তু যদিও তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে উঠে উপমহাদেশের আর দুটি দেশের মতই কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এর ধারাবাহিকতা এ দু দেশের ঐতিহ্যের উত্তরসূরী বলা যায় না। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর জন্ম অধ্যায় দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসই সশস্ত্রবাহিনীর আত্মপ্রকাশ আর তাদের অবদানের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যেক সেনা নায়কের নাম ইতিহাসে করে নিয়েছে নিজস্ব স্থান। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী স্বাধীনতার পরে গড়ে উঠতে থাকে অবহে-লিতভাবে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে সংমিশ্রণ ঘটে মুক্তিযোদ্ধা আর প্রত্যাগত বিরাট সংখ্যক সদস্যদের, যারা সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরিতে দু বছরের জ্যেষ্ঠতা দেয়া হয় যার কারণে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সুষ্ঠু সংগঠনের ভেতরে এর সদস্যদের মাঝে অদৃশ্য টানাপোড়েন থেকে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ ব্যবধান কমিয়ে আনার দায়িত্ব যাদের ছিল সে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব আজও আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিদ্যমান। বিশ্বের সশস্ত্রবাহিনীর ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। ঐতিহাসিক গবেষকগণ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে গবেষণা করবেন বা করছেন।

আমি আমার এ লেখায় কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি সেখানে low Political cultur সম্বন্ধে কিছু বলেছি। আর এ বিষয়ে যারা আরও বিশদ জ্ঞান রাখেন তারা আমার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের সাথে হয়ত একমত হবেন বা ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন তবে একথা আমি একজন প্রাক্তন পেশাদার সৈনিক হিসেবে বিশ্বাস করে আসছি যে, ১৯৭৫ হতে ১৯৮১ সনের মধ্যে সশস্ত্রবাহিনীতে ঘটে যাওয়া ক্ষমতা দখলের পালা, রক্তাক্ত বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব এবং ১৯৮২ সনের মার্শাল 'ল' একদিকে যেমন ছিল মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী সৈনিক অফিসার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের প্রয়াস তেমনি ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনের চরম ব্যর্থতার বহিঃ প্রকাশ। আর এ ব্যর্থতাই জন্ম দেয় এবং তৈরী করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র। জন্ম দেয় একনায়কতন্ত্র, খর্ব করে Democratic proccess.

একটি স্বাধীন দেশের সশস্ত্রবাহিনী সে দেশের অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্গ। আর এর দিক নির্দেশনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব সমাজের এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারি রাজনীতিবিদদের। রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়ার কথা সশস্ত্রবাহিনীর। আর যখনই এটা হতে ব্যর্থ হয় তখনই এর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এক ব্যক্তির ইচ্ছা আর অনিচ্ছার উপরে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের নীতি নির্ধারক রাজনীতিবিদরা এ সত্য হয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি বা সক্ষম হলেও এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে রাজনৈতিক শক্তির সমকক্ষ ভেবে জাতীয় পর্যায়ে সকল কর্মকান্ডের সাথে আত্মীকরণ করা হয় নি যা কিনা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে করা হয়েছে বা হচ্ছে। আজও সশস্ত্রবাহিনী রয়ে গেছে জাতি হতে বিচ্ছিন্ন এক সংগঠন। অনেকে একে ব্যবহার করেছেন ক্ষমতার উৎস আর না হয় ক্ষমতায় টিকে থাকার অবলম্বন হিসেবে। এ পরিস্থিতি জাতির জন্য কখনই মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না।

১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং যা চলতে থাকে প্রায় এক যুগেরও উপরে তার সঠিক বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে রাজনৈতিক ব্যর্থতাই এ ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। দুঃজনক হলেও নিতান্তই সত্য যে, এসব হত্যার দায়-দায়িত্ব বা রাজনৈতিক কারণ সমূহ সমসাময়িক ক্ষমতাশীন কোন রাজনীতিবিদ বা দল বিশ্লেষণ করে তার রাজনৈতিক প্রতিকার

সমূহ চিহ্নিত করেন নি। বরং আজ পর্যন্ত সমস্ত দায়-দায়িত্ব সেনা কমান্ডারদের উপরে চাপানো হয় অবলীলাক্রমে। আর এর জের হিসেবে চলতে থাকে বাদানুবাদ ও চরিত্র হনন। যেমনটা আমি আগেই বলেছিলাম বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সেদিন অনেকে প্রাণের ভয়ের অজুহাতে মোশতাক সরকারে যোগদান করেন কিন্তু অন্যদিকে তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের নির্ভীক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দাবী করে আসছেন। তাদের এ ধরনের বক্তব্য দেশবাসী কিভাবে গ্রহণ করেছেন সেটা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলতে পারবে। যেমনভাবে ঐতিহাসিকরা বলতে পারবেন কেন আজ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতার মর্যাদা দেয়া হয়নি, কেন আজও তিনি বন্দী হয়ে আছেন একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের পোস্টারের সংকীর্ণ গন্ডীতে। এ উপমহাদেশের অন্যান্য জাতির জনকদের বেলায়ত এমনটি হয়নি। কেনই বা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বীকৃত অকতুভয় সৈনিক নেতৃবৃন্দ হবেন বিতর্কিত। ইতিহাসে কেনই বা তাদের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হবে না বা হচ্ছে না। দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে রাজনৈতিক এবং সমর নেতৃবৃন্দের মাঝে কেন থাকবে বৈষম্য এমনটিত হবার কথা নয়। বারংবার কেন জাতি ইতিহাসে বন্দী হয়ে থাকবে যখন সমস্ত বিশ্ব ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। আমাদের দেশের অত্যন্ত তুখোড় রাজনীতিবিদরাও ইতিহাসের গন্ডীতে বন্দী হয়ে আছেন। এসব নিশ্চয়ই আগামী প্রজন্মের জন্য হয়ে থাকবে দিশেহারা হবার কারণ। আমরা সমষ্টিগতভাবে আমাদের রাজনৈতিক কালচারকে সংকীর্ণতা থেকে বের করে যত দিন পর্যন্ত Broad Base করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত বারংবার আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে। আমি নিশ্চিত যে, এসব প্রশ্নের বিশ্লেষণ করে এর সঠিক জবাব আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিরা একদিন দিবেন। আর না হয়ত Only history will tell who were responsible for shading so much of blood and tears and when this would stop.

জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন এবং এ বাহিনীর তৎপরতা, এ বাহিনীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তোলে সে সম্বন্ধেও আমি আমার বিশ্লেষণে বলেছি। অনেকেই বলেছেন স্বাধীনতার পরপরই আইন শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি ছিল সে সময় এ বাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। হয়ত ছিল, তবে এ বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আয়ত্ত্বে আনার জন্য '৭৪ও '৭৫ সনে দু দুবার সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করতে হয়। হয়ত এ বাহিনীর প্রয়োজন ছিল তবে নিয়মতান্ত্রিক বাহিনী সমূহ থাকতে এ অনিয়মতান্ত্রিক, অসংবিধানিক বাহিনী

গড়নের এবং তাকে নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর চেয়েও অধিক ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারটি নিশ্চয়ই সঙ্গত ছিল না। এ বাহিনীকে যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাতে এর মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়েও যথেষ্ট সংসয় থেকে যায়। নিয়মিত বাহিনীকে শক্তিশালী না করে রক্ষীবাহিনী গঠন কতটা সমীচিত ছিল তার ব্যাখ্যাও সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না।

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের পর থেকে যে ঘটনাগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হয়েছে, হতে পারে এর নায়কগণ সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী কিছু অফিসার, কিন্তু এদের পরোক্ষভাবে শক্তি আর সাহস জুগিয়েছে নেপথ্য অন্য কোথাও থেকে। অত্যন্ত সহজভাবে বলা যায় বৈদেশিক যড়যন্ত্র, কিন্তু একবার গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে এ ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে দেশের অভ্যন্তরেই এবং এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা থেকে জাতিকে ভবিষ্যতে অক্ষত রাখতে হলে যা প্রয়োজন তা হল সশস্ত্রবাহিনীকে তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে কর্মদক্ষ করে তোলা এবং সশস্ত্রবাহিনীকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা, আমলাতান্ত্রিক বা একব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে নয়। আরও উপলব্ধি করা যে, সশস্ত্রবাহিনী কোনভাবেই জাতির বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নয় বরং অত্যন্ত শক্তিশালী নিরিবিচ্ছিন্ন অংগ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ, 'উত্তর পাড়া' নয়। আর এ কথা শুধু কথায় নয় কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব সমাজপতিদের, তবেই হয়ত এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সহায়ক হবে।

পরের কথা

এ বইটির রচনাকাল ১৯৯৩-৯৪। তখন দেশে দীর্ঘ বিতর্কিত একনায়কতন্ত্র শেষে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে মঞ্জুর হত্যা ও আরও পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যার বিচার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আরও তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে। একাধিক পর্যায়ে এসব বিষয়ে তদন্তের খবরও পত্রিকা মারফত পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত তাই আমার বইয়ে এসব পুনারাবৃত্তিই করা হয়েছে। তবে বিশ্লেষণ পর্যায়ে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি মাত্র। বিচার্য কোন বিষয়কে ক্ষুন্ন করা হয়নি বলে আমার ধারণা।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Anothny Mascarenhas : *Bangladesh : A Legacy of Blood* Hodder and Stoughton. U.K.

২। Ashok Raina : *Inside RAW : Indias Secret Service* .Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

৩। Major (Retd) Rafiqul Islam : *A Tale of Millions.*

৪। SE Finer : The Man on the Horseback. *The Role of Military in Politics.*West View Press Boulder. Colorado-Printer Publishers London.

৪। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম পিএসপি ঃ *রণাঙ্গনে জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স ;* আনন্দ প্রকাশক, প্যারিদাশ রোড, ঢাকা।

৫। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ঃ *বঙ্গবন্ধু হত্যা ঃ ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস* জ্ঞান প্রকাশনী, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখক পরিচিতি

ব্রিগেডিয়ার এম সাখাওয়াত হোসেন এন ডিসি, পিএসসি(অবঃ) ১৯৪৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সনে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় দু বছর পাকিস্তানের বন্দী শিবিরে কাটিয়ে ১৯৭৩ সনে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৫ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডে স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৯-৮১ সনে ঢাকায় সেনাসদরে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ডাইরেক্টরটে নিয়োজিত হন। পরে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে দুটি ইনফেনট্রি ব্রিগেড ও একটি আর্টিলারি ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন।

লেখক বাংলাদেশের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে দ্বিতীয় বারের মত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিখ্যাত ইউএসএ কমান্ড এন্ড জেনারেল স্টাফ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। তিনি পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে ইসলামাবাদ ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজে মাস্টারস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী সিনিয়র অফিসার হিসেবে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই কোর্স সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাময়ীকিতে লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ জার্নালেও লেখকের 'রিসার্চ পেপার' ছাপা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও মাঝে মধ্যে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে।

লেখক বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেন যার মধ্যে রয়েছে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানী, বেলজিয়াম, সৌদি আরব, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, গণচীন এবং জাপান।

লেখক প্রায় দু'বছরের উপরে সরকার নিযুক্ত সোনালী ব্যাংকের পরিচালক মন্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন।